রসচক্র

শ্রীকালিদাস রায়

সম্পাদিত

1217

।
য়
কে
মনে

প্রকাশক—শ্রীরাধেশ রায়
রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্
৯এ, সাহানগর রোড,
দক্ষিণ-কলিকাতা

891.443
C489
NOT TO BE LENT OUT
NATIONAL LIBRARY
No 2198
Date 30.3.56.
CALCUTTA

মূল্য—দুই টাকা

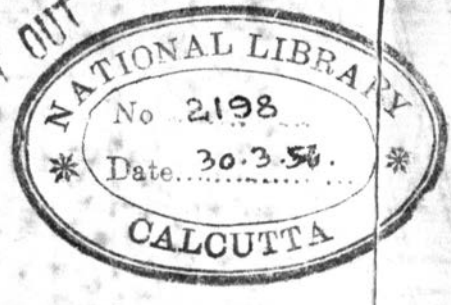

অক্ষয় তৃতীয়া, ১১ই বৈশাখ, ১৩৪৩

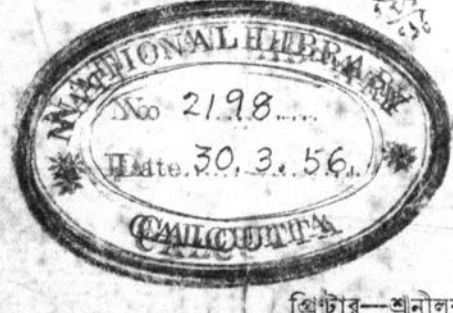

NATIONAL LIBRARY
No 2198
Date 30. 3. 56.
CALCUTTA

প্রিণ্টার—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১নং রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা

ভূমিকা

এই উপন্যাসখানি যে সকল কথাসাহিত্যিকের রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ, তাঁহাদের অধিকাংশই রসচক্রের সদস্য। রসচক্রের সদস্যগণের দ্বারা পরিকল্পিত ও রচিত বলিয়া উপন্যাসখানির নাম দেওয়া হইল 'রসচক্র'। উপন্যাসখানির অধিকাংশ 'উত্তরা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপন্যাসখানির প্রধান গৌরব—ইহার সূত্রপাত হইয়াছে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর লেখনীস্পর্শে। তিনি রসচক্রের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক, তিনি ইহার ভিত্তি স্থাপন না করিলে ইহার সৃষ্টিই হইত না।

উপন্যাসখানির উপসংহরণ একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদিগকে চক্রের বাহিরেই যাইতে হইয়াছে। এজন্য আমরা আমাদের পরমহিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক নরেশচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্যার তথা উপন্যাসের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে রসচক্রের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উপন্যাসের অন্যান্য লেখকগণের উৎসাহে ও চেষ্টায় উপন্যাসখানির সৃষ্টি ও প্রকাশ। সেজন্য তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উপন্যাস খানিতে লেখনী চালনা করেন নাই বটে, কিন্তু ইহা প্রারম্ভ হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত তাঁহারই উৎসাহ, পরিশ্র ও আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

একমাত্র মহিলা যিনি এই উপন্যাস রচনায় সহায় করিয়াছেন—তিনি আমাদের চক্রের সদস্যা ন'ন বটে, কি আমাদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের স ধর্ম্মিণী। তাঁহাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্
দক্ষিণ কলিকাতা

নিবেদক—
শ্রীকালিদাস রায়

লেখক-সূচী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ ৩ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ ও ১৩ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তিতে শেষ।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ ১৩ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তি হইতে আরম্ভ ও ২য় পরিচ্ছেদ ২৭ পৃষ্ঠায় শেষ।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

পরিচ্ছেদ—৩

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পরিচ্ছেদ—৪, ৫, ৬

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পরিচ্ছেদ—৭, ৮

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

পরিচ্ছেদ—৯

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

পরিচ্ছেদ—১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪

শ্রীমনোজ বসু

পরিচ্ছেদ—১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পরিচ্ছেদ—২০, ২১, ২২

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচ্ছেদ—২৩, ২৪, ২৫

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচ্ছেদ—২৬, ২৭, ২৮

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

পরিচ্ছেদ—২৯, ৩০, ৩১

রসচক্র

(বারোয়ারী উপন্যাস)

রাজসাহী সহরের ক্রোশ কয়েক দূরে বিরাজপুর গ্রাম। গ্রামটি বড়—বহু ঘর ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের বাস। কিন্তু মৈত্রবংশের সৌজন্য, সাধুতা এবং স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠার খ্যাতি গ্রাম উপচাইয়া শহর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহাতে মোটা ভাত-কাপড়টাই কোন মতে চলিতে পারিত,—কিন্তু তাহার অধিক নয়। অথচ ক্রিয়াকলাপ কোনটাই বাদ পড়িবার যো ছিল না। অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া ভদ্রাসন, অনেকগুলি মেটে খোড়ো ঘর, মস্ত বড় চণ্ডীমণ্ডপ ;—ইহার সকলগুলিই সকল সময়েই পরিপূর্ণ।

কিন্তু এসব হইত কি করিয়া? হইত, তিন ভাই-ই উপার্জ্জন করিতেন বলিয়া। বড় শিবরতন গ্রামেই জমিদারী-রাজ-সরকারে ভাল চাকরি করিতেন। মেজ শম্ভুরতন শেয়ারের গাড়ীতে জেলা-আদালতে পেস্কারী করিতে যাইতেন। কেবল ন' বিভূতিরতন ধনী শ্বশুরের কৃপায় কলিকাতায় থাকিয়া কোন একটা বড় সওদাগরী অফিসে বড় কাজই পাইয়াছিলেন। সেজ এবং ছোট ভাই শিশুকালেই মারা পড়িয়াছিল, তালিকার ওই দুটা শূন্যস্থান ব্যতীত আর তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

দিন দুই হইল দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেছে ;—প্রতিমার কাঠামোটা উঠানের এক ধারে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে—সহসা চোখ না পড়ে ;—কেবল তাহার মঙ্গল-ঘটটি আজিও বেদীর পার্শ্বে তেমনি বসানো আছে, তাহার আম্রপল্লব আজিও তেমনি স্নিগ্ধ তেমনি সজীব রহিয়াছে,—এখনও একবিন্দু মলিনতা কোথাও স্পর্শ করে নাই।

সকলে ইহারই অদূরে একটা বড় সতরঞ্চের উপর বসিয়া। তিন ভাইয়ের মধ্যে বোধ হয় খরচ পত্রের আলোচনাটা চলিতে চলিতে একটু বিরাম পড়িয়াছিল। বিভূতিরতন একটু ইতস্তত: করিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত মুখখানা হাসির মতো করিয়া কহিল, সেদিন শাশুড়ী ঠাকরুণ আশ্চর্য্য হ'য়ে বলছিলেন, তোমার মাইনের সমস্ত টাকাটা একদফা বাড়ীতে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়। তিনি আবার দরকারমত কিছু নিয়ে বাকীটা ফিরে পাঠিয়ে দেন, এতে মাসে মাসে অনেকগুলো টাকাই পোষ্টাফিসকে দিতে হয়।

সংসার-খরচের খাতাখানা তখনও শিবরতনের সম্মুখে খোলা ছিল,—এবং চক্ষুও তাঁহার তাহাতেই আবদ্ধ ছিল। অনেকটা অন্যমনস্কের মতো তিনি বলিলেন, পোষ্টাফিস মণিঅর্ডারের টাকা ছাড়বে কেন হে? এতে আশ্চর্য্য হ'বার আর কি আছে?

বিভূতির ধনী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর যে কিছুদিন হইতেই কন্যা-জামাতার সাংসারিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ সংশয় শিবরতনের জন্মিয়াছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

বিভূতি মনে করিল, দাদা ঠিকমত কথাটাতে কান দেন নাই, তাই আরও একটু স্পষ্ট করিয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তা'তা বটেই। তাই তিনি বলেন, আপনার আবশ্যকমত টাকাই যদি শুধু—

শিবরতন চোখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, আমার আবশ্যক তোমরা জানবে কি করে?

তাঁহার মুখের উপর তেমনি সহজ ও শান্তভাব দেখিয়া বিভূতির সাহস বাড়িল। সে প্রফুল্ল হইয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাই তিনি বল্‌ছিলেন,

আপনার চিঠি-পত্রের মধ্যে তার একটুখানি আভাস থাকলেও এই বাজে খরচটা আর হ'তে পারত না।

শিবরতন তাঁহার হিসাবের খাতার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আনত করিয়া জবাব দিলেন, তাঁকে বোলো, দাদা একে বাজে খরচ ব'লেও মনে করেন না, চিঠি-পত্রে আভাস দেওয়াও দরকার ভাবেন না। যোগীন, তামাক দিয়ে যা।

বিভূতি পাংশু-মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল এবং শম্ভু দাদার আনত মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া হাতের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারো মুখেই কথা রহিল না,—একটা অবাঞ্ছিত নীরবতায় ঘর ভরিয়া রহিল। কিন্তু ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে এই মৈত্রবংশের ইতিবৃত্তটাকে আরও একটু পরিস্ফুট করা প্রয়োজন।

এই বিরাজপুরে ইহাদের সাত-আট পুরুষেরও অধিক কাল বাস হইয়া গেছে, অনেক ঘর-দ্বার ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, অনেক ঘর-দ্বার আবশ্যকমত বাড়ানো কমানো হইয়াছে, কিন্তু সাবেক-দিনের সেই রন্ধনশালাটি আজও তেমনি একমাত্র ও অদ্বিতীয় হইয়াই রহিয়াছে। কখনো তাহাকে বিভক্ত করা হয় নাই, কখনো তাহাতে আর একটা সংযুক্ত করিবার কল্পনা পর্য্যন্ত হয় নাই। এই পরিবার চিরদিন একান্নবর্ত্তী, চিরদিনই যিনি বড়, তিনি বড় থাকিয়াই জীবনপাত করিয়া গেছেন, পরে জন্মিয়া অগ্রজের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে কেহ কোন দিন প্রশ্ন করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় নাই।

সেই বংশের আজ যিনি বড়, সেই শিবব্রতন যখন ছোট ভাইয়ের অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার শুধু কেবল একটা 'প্রয়োজন নাই' বলিয়াই নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, তখন বড়-মানুষ শ্বশুর-শাশুড়ীর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ মুখ মনে করিয়াও বিভূতির এমন সাহস হইল না যে, এই বিতর্কের একটুকুও জের টানিয়া চলে।

চাকর তামাক দিয়া গেল। শিবব্রতন খাতা বন্ধ করিয়া তাহা হাত-বাক্সে বন্ধ করিয়া অত্যন্ত ধীরে সুস্থে ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, তোমার ছুটির আর ক'দিন বাকি রইল, বিভূতি?

—আজ্ঞে ছ'দিন।

শিবব্রতন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, তা'হলে শুক্রবারেই তোমাকে রওনা হ'তে হবে দেখ্‌ছি।

বিভূতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এই সময়টায় বড় বেশী কাজ-কর্ম্ম, তাই—

শিবব্রতন কহিলেন, তা' বেশ। না হয়, দু'দিন পূর্ব্বেই যাও। দেবীপক্ষ—দিন-ক্ষণ দেখার আর আবশ্যক নেই,—সবই সুদিন। তা'হলে পরশু বুধবারেই রওনা হ'য়ে পড়, কি বল?

বিভূতি কহিল, যে আজ্ঞে, তাই যাবো।

শিবব্রতন আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, ন-বৌমার কাছে বড় অপ্রতিভ হ'য়ে আছি। গত বৎসর তাঁকে একরকম কথাই দিয়েছিলাম যে, এ বৎসর তাঁর ছুটি,—এ বৎসর বাপের বাড়ীতে তিনি পূজো দেখ্‌বেন। কিন্তু দিন যত ঘনিয়ে আস্‌তে লাগল, ততই ভয় হ'তে লাগল, তিনি না থাকলে ক্রিয়া-কর্ম্ম

যেন সমস্ত বিশৃঙ্খল, সমস্ত পণ্ড হ'য়ে যাবে। আদর-অভ্যর্থনা ক'রতে, সকল দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে, তাঁর তো আর জোড়া নেই কি না! এত কাজ, এত গণ্ডগোল, এত হাঙ্গামা, কিন্তু কখনো মাকে বলতে শুন্‌লাম না—এটা দেখিনি কিংবা এটা ভুলে গেছি। অন্য সময়ে সংসার চলে,—বড় বৌ ও মেজ-বৌমাই দেখ্‌তে পারেন। কিন্তু বৃহৎ কাজকর্ম্মের মধ্যে ন'বৌমা নেই মনে ক'বলেই উদ্বেগে যেন আমার হাত-পা গুটিয়ে আসে, কিছুতে সাহস পাইনে। এই বলিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায় মুখখানি দীপ্ত করিয়া তিনি পুনরায় নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

বড কর্ত্তার ন'বৌমার প্রতি বিশেষ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে, ইহা লইয়া বাটীর মধ্যে আলোচনা তো হইতই, এমন কি একটা ঈর্ষার ভাবও ছিল। বডবধূ রাগ কবিয়া মাঝে মাঝে তো স্পষ্ট করিয়াই স্বামীকে শুনাইয়া দিতেন; এবং মেজবধূ আড়ালে অসাক্ষাতে এরূপ কথাও প্রচাব করিতে বিরত হইতেন না যে, ন'বৌ শুধু বডলোকের মেয়ে ব'লেই এই খোসামোদ করা। নইলে আমরা দু'জায়ে এগারো মাসই যদি গৃহস্থালীর ভার টানতে পারি, আর পূজোর মাসটা আর পারি না? বড় মানুষের মেয়ে না এলেই কি মায়ের পূজো আটকে যাবে?

এই সকল প্রচ্ছন্ন শব্দভেদী বাণ যথাকালে যথাস্থানে আসিয়াই পৌঁছিত। কিন্তু শিবরতন না হইতেন বিচলিত, না করিতেন প্রতিবাদ। হয়তো বা কেবল একটুখানি মুচকিয়া হাসিতেন মাত্র। বিভূতি অধিক উপার্জ্জন করে, তাহাকে বারোমাস বাসা করিয়া কলিকাতাতেই থাকিতে হয়, সুতবাং ন'বধূমাতার তথায় না থাকিলে নয়। এ কথা তিনি বেশ বুঝিতেন, কিন্তু অবুঝের দল কোনোমতেই স্বীকার করিতে

চাহিত না। তাহাদেরই একজনকে সংসারের মামুলি এবং মোটা কাজগুলা সারা বৎসর ধরিয়াই করিতে হয় না, কেবল মহামায়ার পূজা উপলক্ষে হঠাৎ একসময়ে আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব, সকল কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে লইয়া তাহা নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিয়া দিয়া, ঘরের এবং পরের সমস্ত সুখ্যাতি আহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া যায়,—সে না থাকিলে এ সব যেন কিছুতেই হইতে পারিত না, সমস্তই যেন এলোমেলো হইয়া উঠিত, লোকের মুখের ও চোখের এই সকল ইঙ্গিতে মেয়েদের চিত্ত একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। কাজকর্ম্ম অন্তে এই লইয়া প্রতি বৎসরেই কিছু না কিছু কলহ-বিবাদ হইতই। বিশেষ করিয়া মা আজও জীবিত আছেন এবং আজও তিনিই গৃহিণী। কিন্তু বয়স অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ায় অপরের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া তিরস্কার ও গালি-গালাজ করার কাজটুকু মাত্র হাতে রাখিয়া গৃহিণীপণার বাকি সমস্ত দায়িত্বই তিনি স্বেচ্ছায় বড় ও মেজ বধূমাতার হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

তিনি ন'বৌকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। সে সুন্দরী, সে বড়-লোকের মেয়ে, তাহার কাপড়-গয়না প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহাকে সংসার করিতে হয় না, সে চিঠি লিখিতে পারে, অহঙ্কারে তাহার মাটিতে পা পড়ে না ইত্যাদি নালিশ এগারো মাস কাল নিয়ত শুনিতে শুনিতে এই বধূটির বিরুদ্ধে মন তাঁহার তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত; এবং দীর্ঘকাল পরে সে যখন গৃহে প্রবেশ করিত, তখন তাহা অনধিকার-প্রবেশের মতই তাঁহার ঠেকিত।

কাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে যে, ধরণী সাণ্ডেলদের বাড়ীর মেয়েদের শরায় সন্দেশ দু'টা করিয়া কম পড়িয়াছিল কেবল তাহারা

গরিব বলিয়াই। এই দুর্নাম শুধু গ্রামে নয়, তাহা সহর ছাড়াইয়া নাকি বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিবার উপক্রম করিয়াছে,—এই দুঃসংবাদ গৃহিণীর কানে গেল—যখন তিনি আহ্নিকে বসিতেছিলেন। তখন হইতে ছত্রিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেছে,—মালা-আহ্নিকের যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কিন্তু আলোচনার শেষ হইতে পায় নাই। দোষ শুধু ন'বৌমার এ বিষয়েও যেমন কাহারও সংশয় ছিল না, নিজে সে বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই ইচ্ছা করিয়া দরিদ্র পরিবারের অপমান করিয়াছে ইহাতেও তেমনি কাহারও সন্দেহ ছিল না। ন'বৌ যে সকল কথাই নীরবে সহ্য করিয়া যাইত তাহা নয়,—মাঝে মাঝে সেও উত্তর দিত; কিন্তু তাহার কোনো উত্তরটাই সোজা শাশুড়ীর কানে পৌঁছিত না, পৌঁছিত বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া। তাই তাহার বক্তব্যটা লোকের মুখে মুখে ঘা খাইয়া কেবল বিকৃতই হইত না, তাহার রেশটাও সহজে মিলাইতে চাহিত না। সকালে আজ বাটীর মধ্যে যখন এই অবস্থা—সান্ন্যাল-পরিবারের মিষ্টান্নের ন্যূনতা লইয়া ন বধূর সম্বন্ধে আলোচনা যখন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরে তখন শিবরতন সেই ন'বধূমাতারই প্রশংসায় মুক্ত-কণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শিবব্রতন কহিলেন, বুধবারে ন'বৌমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। মা আমার আরও কিছুদিন এখানে থেকে যেতে পারলে, যেখানের যা সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে সারা বছরের জন্যে আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রে যেতে পারতেন, কেন না এ সকল কাজ আর কোন বৌয়ের দ্বারাই অমন সুশৃঙ্খলায় হয় না,—কিন্তু কি আর করা যাবে? নিয়ে গিয়ে দু'দশ দিন তাঁর মায়ের কাছে রেখে দিয়ো, তবু বোনদের সঙ্গে দিন কতক আনন্দে

কাটাতে পারবেন। বিভূতি, তোমার বাসায় তো বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না?

বিভূতি কহিল, আজ্ঞে না, অসুবিধা কিছুই হবে না।

শিবরতন বলিলেন, বেশ তাই কোরো। ন-বৌমা বাড়ী ছেড়ে যাবেন মনে হ'লেও আমার বিজয়ার দুঃখ যেন বেশী ক'রে উথলে ওঠে, —কিন্তু কি আর করা যাবে? সবই মহামায়ার ইচ্ছা। সারা বছর সবাইকে নিয়ে সংসার করা—বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া, বোধ করি আরও কি একটু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ উপস্থিত সকলেই একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধা জননী কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবরতন শশব্যস্তে হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শম্ভু এবং বিভূতি তাহারাও অগ্রজের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল; মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—শিবু, আমার গুরুর দিব্বি রইল, তোদের বাড়ীতে আর আমি জল-গ্রহণ কোরব না, যদি না এর বিচার করিস্! ন-বৌ বড় লোকের বেটী, আজ আমাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেচে!

সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি ভাইয়েরা অধিক চমকিত হইতেন না। বিভূতি ভয়ে পাংশু বর্ণ হইয়া উঠিল, শিবরতন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ন'বৌমা! এ কি কখনো হ'তে পারে, মা?

মা তেমনি রোদন-বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন, হয়েও কাজ নেই বাবা, ও যে ন'বৌ! বড় লোকের মেয়ে! তা' যাই হোক, যখন গুরুর

নাম নিয়ে দিব্বি ক'রেছি, তখন বাড়ীতে রেখে বুড়ো মাকে আর মেরো না বাবা, আজই কাশী পাঠিয়ে দাও। যাই তাঁদের চরণেই আশ্রয় নিই গে।

দেখিতে দেখিতে ছেলে-মেয়ে দাসী-চাকরে প্রায় ভিড় হইয়া উঠিয়াছিল, শিবরতন তাঁর ছোট মেয়ে গিরিবালার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি হ'য়েছে রে, গিরি, তুই জানিস্?

গিরিবালা মাথা নাড়িয়া বলিল, জানি বাবা! এই বলিয়া সে সাণ্ডেলদের শরার সন্দেশ কম হইবার বিবরণ সবিস্তারে বিবৃত করিয়া কহিল, ঠাকুরমা ন'খুড়ীমাকে বড্ড গালাগালি দিচ্ছিলেন বাবা।

শিবরতন কহিলেন, তার পর?

মেয়ে বলিল, ন'খুড়ীমা মুখ বুঁজে ঝাঁট দিচ্ছিলেন, সুমুখে ন-কাকার জুতো জোড়াটা ছিল, তাই পা দিয়ে শুধু ফেলে দিয়েছিলেন।

শিবরতন প্রশ্ন করিলেন, তারপরে?

গিরি কহিল, একপাটি জুতো ছিট্‌কে এসে ঠাকুরমার পায়ের কাছে পড়েছিল।

শিবরতন শুধু কহিলেন, হুঁ! মায়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ভেতরে যাও মা। এর বিচার যদি না হয়, তো তখন কাশীতেই চলে যেয়ো।

একে একে ধীরে ধীরে সবাই প্রস্থান করিল, শুধু কেবল তিন ভাই সেখানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, কিন্তু সে শুধু পুড়িতেই লাগিল, শিবরতন স্পর্শ করিলেন না। প্রায়

আধ ঘণ্টাকাল এই ভাবে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া অবশেষ মুখ তুলিয়া বলিলেন, বিভূতি ?

বিভূতি সসম্ভ্রমে কহিল, আজ্ঞে ?

শিবরতন বলিলেন, তোমার স্ত্রীর শাস্তি তুমি ছাড়া আর কারও দেবার অধিকার নেই।

বিভূতি আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞা করুন।

শিবরতন বলিলেন, ঐ জুতো তোমার স্ত্রীর মাথায় তুমি তুলে দেবে ;—উঠনের মাঝখানে তিনি মাথায় নিয়ে সমস্ত বেলা দাঁড়িয়ে থাকবেন। তোমার ওপর এই আমার আদেশ।

আদেশ শুনিয়া বিভূতির মাথার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখ, শালী-শালাজদের মুখ, চাকরীর মুখ, স্ত্রীর মুখ সমস্ত একই সঙ্গে মনে পড়িয়া মুখখানা ভয়ে ভাবনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সে জড়িত কণ্ঠে কহিতে চাহিল,—কিন্তু দাদা, দোষের বিচার না ক'রেই—

শিবরতন শান্ত-স্বরে কহিলেন, মা অত্যন্ত অপমানিত বোধ ক'রেছেন এ তোমরাও দেখলে। তাঁর কি দোষ, কতখানি দোষ—এ বিচারের ভার আমার ওপর নেই। যাঁদের বিচার ক'রতে পারি তাঁদের প্রতি আমার এই আদেশ রইল। এখন কি ক'রবে সে তুমি জানো।

বিভূতি কহিল, আপনার হুকুম চিরদিন মাথায় ব'য়ে এসেছি দাদা, কোন দিন কোন স্বাধীনতা পাইনি। আজও তাই হবে, কিন্তু—

এই কিন্তুটা সেও শেষ করিতে পারিল না, শিবরতনও নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

বিভূতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বোধ করি বা দাদার কাছে কিছু প্রত্যাশা করিল। কিন্তু কিছুই না পাইয়া সে উঠিয়া বলিল, দাদা, আমি চললুম—এই বলিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

শিবরতন কোন কথা কহিলেন না, তেমনি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। পূজার বাড়ী,—আজও আত্মীয়, অনাত্মীয়, কুটুম্ব প্রতিবেশী, ছেলে-মেয়ে, চাকর-দাসীতে পরিপূর্ণ। এই সকলের মাঝখানে, যে ন'বৌমা তাহার পরম স্নেহের পাত্রী, তাহারই এত বড় অপমান, এত বড শাস্তি যে কি করিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা তিনি নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার নত নেত্র হইতে বড় বড় তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা টপ্ টপ্ কবিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,—কিন্তু 'বিভূতি' বলিয়া একবার ফিরিয়া ডাকিতে পারিলেন না, কেবল মনে মনে প্রাণপণ বলে বলিতে লাগিলেন—কিন্তু, মা যে! তাঁর যে অপমান হ'য়েছে!

অনেকক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া শিবরতন মুখ তুলিয়া ডাকিলেন, শম্ভু!

শম্ভুরতন মোটামানুষ, মোটা পঞ্জিকাটার উপর কনুই-এর ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ হইতেই তাহার ঘুম পাইয়াছিল। দাদার ডাক শুনিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে সহসা জাগিয়া উঠিয়া চোখ চাহিয়া বলিল আঁ!

ঘুমের ঘোরে বড় বড় গোল গোল চোখ দুইটা তাহার লাল হইয়া উঠিয়াছে।

শিবরতন বলিলেন. ওই ছাখ্, ভুলেই গিয়েছিলাম। বারুইপুকুরে জেলে পাঠিয়েছি মাছ ধরতে,—ন' বৌমা চলে' যাবেন কিনা···বলিয়াই কেমন যেন হঠাৎ চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সামলাইয়া লইলেন। বলিলেন, তুই একবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারিস শম্ভু ? আড়াই-সের তিনসেরের কম ছোট মাছ যদি জালে ওঠে তো যেন ছেড়ে দেয়। হরি বাগচীকেও খবর পাঠিয়েছি, ভাগ যেন সে ওখানে ব'সে না করে ' এইখানে তাদের ডেকে আনবি। বুঝলি ?

ঘাড় নাড়িয়া শম্ভু তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবরতন একাকী বসিয়া রহিলেন। গড়গড়ার নলটা একবার টানিয়া দেখিলেন, আগুন নিভিয়া গেছে। কাজেই নলটা পুনরায় নামাইয়া রাখিয়া খাতার হিসাবটা আর একবার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেলা অনেক হইয়াছিল। বাড়ী ও প্রাচীরের ছায়াটুকু বিলুপ্ত করিয়া মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্রে উঠান ভরিয়া গেছে। রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল বলিয়া সতরঞ্চিটা তিনি নিজেই দুহাত দিয়া টানিতে টানিতে ঠাকুর-ঘরের উপরে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইখানে নিজের বসিবার মত একটুখানি জায়গা করিয়া লইয়া তাহারই উপর খাতাপত্র, পঞ্জিকা, দোয়াত-কলম ও গড়গড়াটা নামাইয়া রাখিয়া কি যে ভাবিতে বসিলেন কে জানে !

(২)

হরি বাগচী ও জেলেদের সঙ্গে লইয়া শম্ভু যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তিনি হেঁটমুখে হিসাব পরীক্ষার নাম করিয়া কি যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাহারা যে সদলবলে চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও তিনি এতক্ষণ টের পান নাই।

হারাণ কৈবর্ত্তের হাতের মাছটার দিকে আঙুল বাড়াইয়া বাগচী বলিয়া উঠিল, এই মাছটার ওজন আন্দাজ কত হবে কই বল দেখি শিবু!

শিবরতন হরি বাগচীর সমবয়সী, বরং বয়স তাহার কিছু বেশিই হইবে।

প্রশ্ন শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।—এসেছ তোমরা? কি বললে? ওটার ওজন? তা—তা হবে হয়ত সের-চারেক।

উহুঁ, হোলো না ঠিক। বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া বাগচী বলিল, কেশবের দোকান থেকে বাটখারাটা নিয়ে আয় ত' হারু! যা, দৌড়ে যাবি আর আসবি। আমার নাম করে' বলিস্ তা'হলেই দেবে।

মাছটা উঠানে নামাইয়া দিয়া কাঁধে জাল লইয়াই হারাণ ওজনের দাঁড়ি পাল্লা আনিতে গেল।

শম্ভুর আর তর্ সহিতেছিল না। এই মাছ ভাগ হইবে, কোটা হইবে, রান্না হইবে, তারপর খাওয়া। বেলাও কম হয় নাই। শম্ভু বলিল, ধেৎ তেরি! এমনিই ভাগ কর না হে! ভারি ত' তোমার দু' আনা অংশ, তার আবার···।

বাগচী হাসিল। বলিল, সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে কাছারী যাওয়া অভ্যেস কিনা, বেলা হ'লে কষ্ট হয়; না রে শম্ভু?

বলিয়াই শিবরতনের মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ শ্লেষের ভঙ্গীতে কহিল, পিয়ারী চৌধুরীর নায়েব ত' আর নই, নইলে কালী ভাদুড়ীর অংশটা যে আমার কাছেই আসতো না—তাই-বা কে বল্লে! গরীব লোকের দু' আনা—দু' আনাই যথেষ্ট! না, কি বল শিবু!

কথাটা শিবরতনের ভালো লাগিল না। কিছু দিন পূর্ব্বে বারুই-পুকুরের দশ আনা অংশ কালী ভাদুড়ীর কাছ হইতে তিনি কিনিয়া লইয়াছেন। এই লইয়া হরি বাগচীর সঙ্গে বেশ একটা পাকাপাকি ঝগড়ার সূত্রপাতই হইয়াছিল। আজ আবার কথায় কথায় সেই কথাই উঠিয়া পড়িয়াছে। অন্যদিন হইলে তিনিও ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। কিন্তু আজ তাঁহার মনের অবস্থা ভালো ছিল না বলিয়াই হোক, কিম্বা শম্ভুরতনের মুখ-চোখের অবস্থা দেখিয়াই হোক, নিতান্ত অবিচলিতভাবে শম্ভুকে একবার চোখের ইঙ্গিত করিয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, বেশতো, ওজন ক'রেই নাও না! যোগীনকে একবার তামাক দিতে বল তো শম্ভু!

শম্ভু নিতান্ত নিরীহ মানুষ, কিন্তু রাগ চড়িলে তাহার আর জ্ঞান থাকে না। তাই তিনি কৌশলে তাহাকে সেখান হইতে বিদায় করিয়া পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতেছিলেন, এমন সময় দাঁড়ি-পাল্লা লইয়া হারাণ ফিরিয়া আসিল।

যোগীনের তামাক দিতে, ওজন করিয়া করিয়া কাটিয়া কুটিয়া মাছ কয়টার চুল চেরা ভাগ করিতে দেরি নিতান্ত কম হইল না।

গিরিবালা মাছ-কোটা দেখিয়া গিয়া আবার একবার ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বাবা, মা জিজ্ঞেস্ করলে—মাছ কি এই বেলা বাঁধতে হবে, না ও-বেলার জন্যে ভেজে রাখবে।

শিবব্রতন বলিলেন, যা-খুসী তাই করতে বলগে মা। সে তোর বাকী-মাকে জিজ্ঞেস্ করলেই তো হয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিবালা আবার আসিয়া দাড়াইল। বলিল, চান কর বাবা, বেলা হয়েছে অনেক।

হ্যা, মা, করি। বলিয়া তিনি উঠিতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে হইল, বলিলেন, তেল আর গামছাটা আমায় এইখানেই এনে দে মা, আর যোগীনকে বল, এইগুলো যেন তুলে রাখে।

শিবব্রতন পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, আদ্যাস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়াই দেখেন, তাঁহার মুনিষ—বঙ্কিনাথ, গাড়ীর জোয়াল, আলান্‌গুজি ও ছোট একটা সতরঞ্চ লইয়া ঘরে আসিয়াছে। ন' পাড়ার পিসিমা তাঁহার তিন চারিটি ছেলেমেয়ে লইয়া পূজা উপলক্ষে এ বাড়ী আসিয়াছিলেন, আজ প্রত্যুষে তাঁহার যাইবার কথা। শিবব্রতন জিজ্ঞাসা করিলেন, এতক্ষণে গাড়ী ফিরে এলো,—পিসিমা কি ভোরের ট্রেনটা পাননি নাকি, বঙ্কিনাথ?

গাড়ীর জোয়াল্‌টা বঙ্কিনাথ মেটে ঘরের বাহিরের দিকে একটা দেওয়ালের গায়ে ছাঁচতলার কাছে টাঙ্গাইয়া রাখিতেছিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ পেয়েছিলেন। গাড়ী যে আমি আবার নিয়ে গিয়েছিলাম ইষ্টিশানে।

—আবার কেন ?

বদ্যিনাথ অবাক্ হইয়া গেল, বাবু জানেন না কি রকম ? ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, ন'বাবু যে কলকাতা গেলেন বৌ-ঠাকরুণকে নিয়ে, তাঁদেরই তো দিয়ে আসছি।

--ন' বৌমা ? বিভূতি ? কলকাতা গেল !—বলিয়া শিবরতন একবার এদিক-ওদিক তাকাইলেন। মাথার ভিতরটা তাঁহার কেমন যেন করিতে লাগিল। আর একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। ঘরের ভিতর গিয়া শুক্‌নো কাপড় পরিয়া ডাকিলেন, গিরিবালা ?

গিরিবালা ছুটিয়া তাহার বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি বাবা, আমায় ডাকছিলে তুমি ?

শিবরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে তোর কাকীমা কাকাবাবু কলকাতা গেল, তুই দেখেছিস ? কিছু ব'লে গেছে ? জিজ্ঞেস্ কর তো তোর মাকে ?

বড় গিন্নী বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কিছু জানেন না যেন—ন্যাকা ! পূজো তো চুকে গেছে —আবার কি ! বড়লোকের মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল চুপিচুপি —এইবার তোরা খেটে খেটে মর।

স্তম্ভিত হতবাক্ শিবরতন দরজার একটা কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চোখের সুমুখে ঘুরিতে লাগিল।

বড় বৌ বলিলেন, পাঠাবে তা আমরা জানি। তার আবার এত ঢং কেন ?—মায়ের কলেরা হয়েছে, টেলিগেরাপ এসেছে, দেখতে পাবে

না—মা গো মা! শহরের মেয়ে এতও জানে। আমাদের তো সহজে কান্নাই আসে না, আর ওর কেমন চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে' জল পড়তে লাগল।

বিভূতির চেহারা হইয়াছে—ঠিক যেন পলাতক খুনী আসামীর মত। সারা পথ সে শুধু তাহার দাদার ক্রুদ্ধ মুখখানা মনে করিয়াছে আর ভয়ে-ভাবনায় কাঠ হইয়া গেছে। এমন কি স্ত্রীর সহিত ভাল করিয়া একটি বারের জন্যও কথা কহিতে পারে নাই।

গাড়ী আসিয়া বাসার দরজায় থামিল। বিভূতি নামিল, বিভূতির স্ত্রী জয়া নামিল। জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক্ আর একটা বিছানার বাণ্ডিল। গাড়োয়ান নিজেই সেটা মাথায় লইয়া দরজায় ঢুকিতে যাইতেছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র জয়ার ছোট দুইটি ভাই-বোন ছুটিতে ছুটিতে নীচে আসিয়া 'দিদি' 'দিদি' বলিয়া চীৎকার করিয়া নাচিয়া হাসিয়া হট্টগোল বাধাইয়া তুলিল।

ছোট ভাইটিকে আদর করিয়া চুমা খাইয়া বোনটিকে কাছে টানিয়া আনিয়া হেঁট হইয়া ভয়ে ভয়ে বিষণ্ণ মুখে জয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে মা কেমন আছেন মায়া?

ঘাড় নাড়িয়া মায়া বলিল, ভাল আছে।

জয়া বলিল, হয়েছিল কি রে? অসুখ কি খুব বেশি হয়েছিল?

মায়া বলিল, কই নাতো! অসুখ হবে কেন?

পশ্চাৎ হইতে বিভূতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সিঁড়ি

ভাঙ্গিয়া হাসিতে হাসিতে মা নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, বাক্স বিছানা এইখানেই রাখব তো বাবু?

বিভূতি বলিল, হ্যাঁ, রাখ।

কিন্তু জয়া তখন একেবারে চকচকিয়া গেছে। একবার মায়ের মুখের পানে একবার স্বামীর মুখের পানে বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া কাহাকে কি যে জিজ্ঞাসা করিবে কিছুই ভাল ঠাহর করিতে পারিতেছিল না, অবশেষে মায়ের কাছে আগাইয়া গিয়া ঈষৎ হাসিয়া মায়ের আঁচলের পাড়টা দু'হাত দিয়ে টানিয়া সোজা করিতে করিতে বলিল, ছি ছি, মিছামিছি তোমার অসুখের কথা শুনে সারাপথ ধরে' শুধু—

হাসিয়া মা বলিলেন, সে কি রে। কই অসুখ ত' আমার হয়নি।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া কোচ্‌ম্যানের হাতে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বিভূতি হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া মাকে প্রণাম করিতেছিল, তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া জয়া বলিল, ছি ছি এ কি ছেলেমানুষি তোমার হ'ল বল ত? মায়ের অসুখ—টেলিগ্রাম এসেছে······আসবার সময় কারও কাছে একটিবার···না বাপু না···ছি!'

বিভূতি হাসিয়া তাহার শাশুড়ার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, সে-সব অনেক কথা মা, আপনাকে বুঝিয়ে বলব' খন। ও বুঝবে না।

সকলেই উপরে উঠিয়া গেল। স্নান করিল, খাওয়া-দাওয়া হইল, কিন্তু জয়ার সেই এক কথা।—ছি, ছি, কি কাণ্ডটা তুমি করলে বল ত? কেন করলে বলবে না?

—বলব বাত্রে। বলিয়া দিনের বেলাটা বিভূতি কোনো বকমে তাহাব স্ত্রীব কাছ হইতে পালাইযা পালাইযা বেড়াইতে লাগিল।

বাত্রে আহাবাদিব পব শযন কবিতে গিযা বিভূতি বলিল, ভয়ানক ঘুম পেযেছে আমাব।

জযা বলিল, জানি। কিন্তু কি হযেছে তুমি বল আগে, তাবপব ঘুমোবে।

স্ত্রী নাছোড়বান্দা। কিছুতেই যখন ছাড়িবে না তখন সে ভণিতা কবিতে সুরু কবিল।—আচ্ছা এই যে আমাদেব তিন ভাই-এব একসঙ্গে থাকা— এটা কি তুমি পছন্দ কব?

জযা বলিল, তা না হয কবি না, কিন্তু তাই ব'লে কি চোবেব মত পালিযে আসতে হবে? ঝগড়া কবতে হবে?

বিভূতি বাগিযা উঠিল। বলিল, ঝগড়া কবেছি যার সঙ্গে? ঝগড়া তো কবিনি।

—নিশ্চযই কবেছ। আমাব তো সেই ভযই হচ্ছে।

বিভূতিভূষন বলিল, ঝগড়া অবশ্য কবিনি, কিন্তু যা কবেছি তা শুধু তোমাবই জন্যে।

কি কবেছ শুনি?

বিভূতি তখন তাহাব মাতাব জুতা ছুড়িযা মাবা অপবাদ হইতে আবম্ভ কবিযা অগ্রজেব শাস্তিব হুকুম পযান্ত সব কথাই তাহাকে খুলিযা বলিল।

তাব পব বলিল, শেষে এও কি আমায শুনতে হবে নাকি?

জযার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহিব হইল না। নতমুখে তাহাকে

নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিভূতি আবার বলিল, ভাল করেছি কি মন্দ করেছি তা তোমার মাকে জিজ্ঞেস্ করগে যাও, দিদিকে জিজ্ঞেস্ করে' এসো।

জয়া তথাপি নিরুত্তর।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঘুমোলে নাকি ?

বিভূতি বলিল, না। কেন ?

জয়া বলিল, কাল তুমি আবার আমায় সেখানে নিয়ে চল।

এ-কথা যে সে তাহাকে বলিতে পারে সে বিশ্বাস বিভূতির ছিল না। সে একবার চোখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, পাগল হ'লে নাকি ? তা আমি পারব না।

জয়া তাহা জানে। এত বড় একটা অপরাধ করিয়া আবার দাদার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইবার সাহস তাহার নাই। কাজেই সে আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

কিন্তু এক পক্ষ চুপ করিলেই যে অপর পক্ষ চুপ করিবে তাহার কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম কিছু নাই। বিভূতিরতনের চোখের ঘুম যে কোন্ দিকে উড়িয়া গেল কে জানে। জয়ার হাতে ধরিয়া জয়াকে কাছে টানিয়া আনিয়া এবং আরও কত রকম করিয়া ক্রমাগত তাহাকে শুধু সে ওই এক কথাই বুঝাইতে লাগিল যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপর বিতৃষ্ণা যখন তাহাদের জন্মিয়াছে, তখন তাহাকে যে-কোনও রকমে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য এবং তাহার জন্য প্রথমতঃ যদি একটুখানি ছল-চাতুরীও অবলম্বন করিতে হয় তো তাও ভালো। বড় কাজ

করিতে হইলে ইহার জন্য দুঃখ করা চলে না। দুঃখ যে করে সে নির্ব্বোধ।

কিন্তু নির্ব্বোধই হোক আর যাই হোক, জয়ার সেই চিন্তা-ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ মুখখানি কোনোপ্রকারেই সেদিন আর সে প্রসন্ন করিতে সক্ষম হইল না। সেই যে সে গুম্ হইয়া পড়িয়া রহিল, সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে না পারিল ভাল করিয়া ঘুমাইতে, না পারিল হাসিয়া দুটা কথা বলিতে। পরদিন প্রভাতে জয়া তাহার ছোট ভাইটিকে ধরিয়া বসিল। ভাইটি কলেজে পড়ে। পূজার ছুটি। কলেজ তখনও বন্ধ। জয়া বলিল, শিশির, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোকে একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে।

শিশির বলিল, কোথায় মেজদি?

জয়া বলিল, বিরাজপুর।

—বা-রে, কাল এসে আবার আজ যাবে, তার মানে?

জয়া বলিল, আছে কাজ ভাই, তুই যাবি কিনা বল্।

শিশির আবার আপত্তি তুলিল, কেন, জামাইবাবু যাবেন না?

—তবে যাসনে, যা তোকে যেতে হবে না!

বলিয়া রাগিয়া মুখ ভারি করিয়া জয়া চলিয়া যাইতেছিল, শিশির বলিল, আচ্ছা বেশ, তাই যাব মেজদি, যাব। মাকে বলেছ? বাবা জানেন?

জয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, জানেন। আয় তবে তোকে খাইয়ে দিই! এক্ষুনি গাড়ী ডেকে আনতে হবে।

শিশির রাজি হইল, এবং খাইয়া জামা-জুতা পরিয়া গাড়ীও সে ডাকিতে গেল। জয়া তখন নিজে খাইতে বসিল। কিন্তু মা মেয়েকে

বারে-বারে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কি রকম পাগল মেয়ে মা তুই! চিরকালই কি তুই অমনি ছেলে মানুষই থাকবি?

দিদি বলিল, নিজের ভাল যে বোঝে না মা তাকে আর তুমি কেমন করে' বোঝাবে বল? এখন তো আর বুঝবে না, বুঝবে যেদিন ওই ভাসুর যাবে মরে'। একসঙ্গে থেকে হা-ভাত হওয়া বেরোবে সেদিন।

মা বলিলেন, আর সে-মিন্‌ষেই বা কেমন-ধারা মানুষ তা তো আমি বুঝিনে মা! শুনি বৌকে ভালোও বাসে, আবার জুতো মাথায় দিয়ে উঠোনের মাঝখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে—

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে দিদি বলিয়া উঠিল, আমি হ'লে কি করতাম জানো মা? সেই জুতো আমি ভাসুরের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে

—চুপ কর দিদি।

জয়ার ক্রুদ্ধ কণ্ঠের স্বর শুনিয়া মা ও মেয়ে দু'জনেই তাকাইয়া দেখিল, তাহার মুখখানা যেন সহসা আগুনের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

চেহারা দেখিয়া কেহ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। জয়াও তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের গ্রাস ফেলিয়া দিয়া ভাতের থালা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিভূতিরতন তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরের ভিতর দেওয়ালে টাঙানো বড় একটা আশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তখন দাড়ি কামাইতেছিল। মুখে সাবানের ফেনা, হাতে ক্ষুর। যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জয়া তাহাকে একটি প্রণাম করিতে আসিয়াছিল।

বিভূতি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একান্তই চল্‌লে তা'হলে? সেখানে গিয়ে কি করবে প্রথম? কি বলবে?

প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া জয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, স্বামীর মুখের পানে একবার তাকাইয়া আবার তৎক্ষণাৎ মাথা নত করিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো।

—কেন?

—বড় ঠাকুরের মনে কষ্ট দিতে আমি পারব না। শাস্তি তাঁর মাথা পেতে নিতেই চললাম।

বলিয়া জয়া সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল।

বিরাজপুরের এমনি হতভাগা ষ্টেশন যে, সেখানে না পাওয়া গেল একখানা গাড়ী, না পাওয়া গেল পালকি।

রৌদ্র চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গ্রামখানা বেশি দূরে নয়, রাস্তাও ভালো। শিশির বলিল, এখানে তুমি বোস দিদি, গাঁ থেকে আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি।

জয়া বলিল, কাজ নেই ভাই, চল্ আমরা হেঁটেই যাই। সুটকেশটা তুই হাতে নিবি, আমি তোর পিছু-পিছু বেশ যেতে পারব।

শিশির হাসিয়া বলিল, পায়ে হেঁটে শ্বশুরবাড়ী যাবে মেজদি? লোকে দেখলে হাসবে না?

জয়া বলিল, হাসুক্।

তাহার তখন এমনি মনের অবস্থা যে, কোনো রকমে সেখানে সে

পৌঁছিতে পারিলে বাঁচে। বলিল, এখানে একা-একা বসে' আমি থাক্‌ব কেমন করে' বল্‌ত? না আছে ওয়েটিং রুম্‌, না আছে বসবার জায়গা। না ভাই, চল্‌ তার চেয়ে যাওয়াই ভাল।

অগত্যা তাহাদের হাঁটিয়াই যাইতে হইল।

শিশির মাঝে মাঝে হাসিয়া হাসিয়া একেবারে ঢলিয়া পড়িতেছিল। —মেজদি, ধূলোয় তোমার পা-দুটো কি হলো ছাখ।

জয়া তাহার পায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সত্যই তাই। অন্য সময় হইলে সেও আজ কম হাসিত না, কিন্তু তাহার সে উচ্ছ্বসিত হাসির পরিবর্ত্তে ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটুখানি হাসিয়া কহিল, পুকুরে ধুয়ে নেব চল্‌।

চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসিয়া জয়ার বুকের ভিতরটা দুর্‌ দুর্‌ করিতে লাগিল। শিশির এ গ্রামে এই প্রথম আসিতেছে। পথ-ঘাট তাহার অজানা। জয়া আগাইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, তাড়াতাড়ি চ'লে আয় আমার পিছু-পিছু, কোনোদিকে তাকাস্‌ নে।

রৌদ্রের তাপে দু'জনেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া ঘরে ঢুকিল। গিরিবালা কোথা হইতে দেখিতে পাইয়াছিল, ছুটিয়া একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, এই যে কাকীমা গো!

আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পশ্চাতে তাহার অপরিচিত আগন্তুকটিকে দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইয়া সে চুপ করিল।

উঠানের মাঝখানেই জয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, মাথা নীচু করিয়া গিরিবালার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, চুপি-চুপি বলিল, বাবাকে তোর

ছুটে গিয়ে বল যে, ন'কাকীমা এসেছে। যাও তো মা, লক্ষ্মী মা আমার।

গিরিবালা অবাক্ হইয়া কাকীমার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। বলিল, বাবা যে কাশী চলে' গেছেন কাকীমা, তুমি জানো না বুঝি?

—কাশী?—জয়া একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল, কখন?

গিরিবালা বলিল, কাল সন্ধ্যে বেলায়, · ঠাকুমাকে নিয়ে,··· গোরুর গাড়ী ক'রে·

জয়ার মাথার ভিতরটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। তাহার হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই রৌদ্রতাপিত প্রাঙ্গণের উপর গলদ্ঘর্ম্ম অবস্থায় বিবর্ণ ম্লান মুখে তাহারা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াই রহিল। তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া আনিয়া বসানো দূরে থাক্, দু' জনের মধ্যে একজনও দরজার ফাঁকে একটিবার মাত্র উঁকি মারিয়াও দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

(৩)

গাড়ীতে বসিয়া শিবরতনের অন্তর মথিত হইতে লাগিল। তিনি একদিকে মাতৃভক্ত সন্তান—অতুল তাঁহার মাতৃভক্তি; অন্যদিকে তিনি স্নেহময় অগ্রজ। অনুজ যে কুললক্ষ্মীকে গৃহায়তনে আনয়ন করিয়াছেন তাহার প্রতি শিবরতনের সসম্ভ্রম স্নেহানুরাগ অপরিমিত। মায়ের সঙ্গে তিনি কাশী যাত্রা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার চোখের সম্মুখে যে মূর্ত্তি বিরাজ করিতে লাগিল তাহা কাশীনগরী, অন্নপূর্ণা বা বিশ্বেশ্বরের নহে। মনোবেদনা মাঝে মাঝে অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু বেদনার প্রবলতর কারণ কে, জননী কি ভ্রাতা, তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হইল না। মাতা নীরদকে অকারণে ভর্ৎসনা, এমন কি অপমান করেন,—তাহা তিনি গিরিবালা এবং অন্যান্য লোকের মুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন; কিন্তু জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া প্রতিবাদের ইচ্ছা তাঁর মনে ঘুণাক্ষরেও কখনও উদিত হয় নাই—অথচ ঐ অশান্তি নিবারণের জন্য তিনি মনে মনে কত উৎসুক আর কত প্রস্তুত তাহার ইয়ত্তা নাই। গৃহের এই অশান্তি দূরীভূত হইলেই যে সুখ লাভ করা যায়, শিবরতনের মনে হয়, সে সুখের সীমা নাই। যাহা সমস্যা এবং আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল আজ তাহা সঙ্কটে পরিণত হইয়া দেখা দিয়াছে।

শিবরতন ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া মায়ের দিকে চাহিলেন, এবং হঠাৎ যে অন্তর্দাহ জাগিল তাহাকে যেন প্রশান্ত করিতে তাড়াতাড়ি একবার ঢোক গিলিলেন। মনে পড়িল, দুর্গোৎসবের কথা;—সমস্ত আয়োজন, কলরব, উৎসাহ, প্রীতি আর সমারোহের উপরে ব্যাপ্ত

হইয়া ছিল দশভুজা প্রতিমার প্রসন্ন হাসিটি—শরতের নির্ম্মল রৌদ্রের উপরেও তাহাই ভাসিতেছিল।

সে হাসিটি মনের আকাশ উজ্জ্বল করিয়া কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রস্ফুটিত ছিল, কিন্তু তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেছে। শিবব্রতন শিহরিয়া উঠিলেন—জগন্মাতা তাঁহার আশীর্ব্বাদ বুঝি তুলিয়া লইয়াছেন তাহাদের সংসারের আশ্রয় তবে কি রহিল।

জননী বিশ্বেশ্বরের কাছে চলিয়াছেন, কিন্তু বৃথাই চলিয়াছেন বুঝি। ত্রিতাপ-তাপিত মানুষের হৃদয়ের জ্বালা হরণ করিবার সাধ্য বিশ্বেশ্বরের আছে কি না, কে জানে কিন্তু তাহার শ্রীচরণে দুঃখ নিবেদন করিয়া নিষ্মুক্ত হইবার অধিকারও কি মানুষের সকল সময় আছে!

শিবব্রতন তাহার মায়ের পাশেই বসিয়াছিলেন। গাড়ীতে অপর একটি ভদ্রপরিবার কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে, অনেকদূর পর্য্যন্ত তাহারা যাইবে। সুতরাং বিছানাপত্র মেলিয়া খাবার-দাবার ছড়াইয়া, ষ্টোভ জ্বালিয়া তাহারা গাড়ীখানাকে একটি আদর্শ একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারের বাস-গৃহ করিয়া তুলিয়াছে। এইসব হট্টগোলের মাঝখানে শিবব্রতন এবং তাহার মা চুপ করিয়া নীরবে একটি পাশে বসিয়াছিলেন। কি মনে করিয়া শিবব্রতন হঠাৎ মায়ের কাছে আরও ঘেঁসিয়া বসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, বিশ্বেশ্বর আমাদের প্রণাম গ্রহণ করবেন না, মা। —বলিয়া দৃষ্টি নত করিলেন।

জননীর মনে ক্রোধ ছিলই। বিশ্বেশ্বর তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদের যাত্রা বৃথা হইবে, পুত্রের মুখের এ-কথাটাকে তিনি কটূক্তি মনে করিয়া ভ্রূভঙ্গী করিলেন। বলিলেন, করবেন না।

খবর পাঠিয়েছেন বুঝি? কি অপরাধ ঘটেছে?—বলিয়া তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

শিবরতন উঠিয়া আসিয়া নিজের জায়গায় বসিলেন।

বিভূতির স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবার সংবাদ হঠাৎ পাইয়া মন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ন'বধূকেও মনে মনে পরম অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার অন্তরের ভরসাস্থল এবং স্থিতির মূল পর্য্যন্ত যেন শিথিল হইয়া গিয়াছিল।

আর একটা কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। বিভূতি সর্ব্বান্তঃকরণে অগ্রজের অনুগত হইলেও সে যে অতিশয় ধূর্ত্ত তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ধনবান্ শ্বশুরের গৃহে অবস্থান করিয়া তাহার মানসিক অবনতি নিশ্চয় ঘটিয়াছে, সেই দিক্‌কার চক্ষুলজ্জা এড়াইতে সে প্রাণপণ করিবেই। বিভূতিই ধনীর কন্যা এবং ধনীর গৃহের সম্ভ্রম বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে লইয়া পলায়ন করে নাই তো! হয়তো বিভূতি জোর করিয়াছিল, কিংবা—কি করিয়াছিল কে জানে; কিন্তু এমন তো হইতে পারে যে, বধূমাতা পলায়ন সম্পর্কে নির্দ্দোষী।

জননীকে অপর কাহারো সঙ্গে কাশী পাঠাইয়া বিভূতিকে সস্ত্রীক আহ্বান করাই তাঁর উচিত ছিল; এরূপ সাংঘাতিক ঘটনাকে এরূপ অব্যবস্থিত অবস্থায় ফেলিয়া আসা কিছুমাত্র উচিত হয় নাই।

শিবরতন মায়ের দিকে চাহিলেন—

বিশ্বেশ্বরের দুয়ারে জননী চলিয়াছেন আত্মদান করিয়া দেবতাকে একান্ত করিয়া লাভ করিতে নয়, ক্রোধের বশে; বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে টানেন নাই—টানের অনুভূতিই জননীর প্রাণে নাই।

শিবরতনের একটি নিশ্বাস পড়িল; এবং পরক্ষণেই তাঁহার দ্বিধা ঘুচিয়া অস্থির মন সুস্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অত্যন্ত ধীর অথচ কম্পিত কণ্ঠে শিবরতন বলিলেন, মা, এবার যেখানে গাড়ী দাঁড়াবে সেইখানেই আমরা নামব।

রাসেশ্বরী মুখ না ফিরাইয়াই বলিলেন, কেন?

শিবরতন বলিলেন, কাশী যাওয়া আমাদের হ'তে পারে না। বিশ্বেশ্বরের কাছে তুমি কি নিয়ে যাচ্ছ, মা?

—আমি তার হিসেব দিতে পারিনে। তুমি না যেতে চাও নেমে যেও। কিন্তু আমি যাবই।—বলিয়া রাসেশ্বরী আরও একটু ঘুরিয়া বসিয়া পুত্রের দিকে একেবারেই পিছন ফিরিলেন।

গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীদের দৃষ্টি বাঁচাইয়া মায়ের চরণে ধীরে ধীরে হাত রাখিয়া শিবরতন বলিতে লাগিলেন,—আমি তোমার বড় ছেলে, মা! জানো তো তুমি, আমি কারো অপরাধ ক্ষমা করিনে। আমি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলাম, সে ব্যক্তিকে তা' গ্রহণ করতেই হবে —যেখানেই সে পালাক না। সে কাজটা হ'য়ে যাক, তোমার মন সুস্থ হোক—বিশ্বেশ্বর নিজে তখন তোমাকে কাছে ডাকবেন; তোমাকে তখন কাশীতে রেখে আসব, এখন চলো ফিরে। আমার কথা শোনো, মা। তোমার পা আমি ছাড়ব না।

বলিতে বলিতে শিবরতনের গলা ধরিয়া আসিল।

এ-কথায় কাজ হইল।

দেবতার সমীপস্থ হইবার জন্য মনের যে অনাবিল প্রসন্নতা চাই তাহার অভাব রাসেশ্বরীকে ধীরে ধীরে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল

—সংস্কার বহুক্ষণ দমনে থাকিবার নয়। ন'বৌকে শাস্তি লইতেই হবে,—শিবরতনের এই দৃঢ়তাও তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল, তার উপর, উপযুক্ত পুত্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করিতে তাঁহার পূরা সাহস আসিল না। কিন্তু শপথ করাইয়া লইলেন। বলিলেন, শাস্তি দিবি তুই?

দেব, মা। তোমার অপমান যে-গৃহে হয় সে-গৃহ তো আমার পক্ষে আর গৃহ থাকে না।—বলিয়া শিবরতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জননী একটি আক্ষেপের নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কাতরস্বরে বলিলেন, বিশ্বেশ্বর চরণে স্থান দিলেন না, শিবু, আমার গতি হ'ল না। বলিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিলেন।

কথাগুলি শিবরতনের কানে গেল, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না।

* * *

জয়া যখন ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহে শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌছিল বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, শরতের রৌদ্রে মেঘের স্পর্শ নাই—রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর এবং শম্ভুরতন সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া ছিপ আর মোড়া লইয়া মৎস্য শিকারে বাহির হইয়া গেছেন। ইতিপূর্ব্বে রৌদ্র কখনো জয়ার মাথায় এমন করিয়া লাগে নাই। উত্তপ্ত ধূলির স্পর্শ কেমন, তার পদতল তাহা কখনো অনুভব করে নাই।

যে অপরাধের বোঝা মাথায় করিয়া জয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে তাহা যেমন গুরুভার তেমনি লজ্জাকর। তাহাতে কেবল তাহার মাথাই নত হইয়া যায় নাই—ধিক্কারে অন্তরাত্মা হাহাকার করিতেছিল।

কিন্তু তাহাকে কেহ প্রশ্ন করিল না।—কেন গিয়াছিলে, কেন

আসিলে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ীর কেহ বাক্যব্যয় করিল না। এমন কি গিরিবালাকে পর্য্যন্ত কে কোথায় আট্‌কাইয়া রাখিল তাহারও তল্লাস মিলিল না। আত্মীয়কুটুম্ব যাঁহারা পূজা উপলক্ষে উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন, নিরানন্দের সঞ্চার হইতেই তাঁহারা চক্ষুলজ্জায় তাড়াতাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। জয়ার জা-দু'টি যে আক্রোশে আর ঈর্ষায় আবহমান কাল দগ্ধ হইতেছিলেন তাহার জ্বালা কমিয়া আসায় তাঁহারা অন্তরালে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া একবার হাসিতেছিলেন, একবার গম্ভীর হইয়া যাইতেছিলেন।

কিন্তু সমাদর আর অভ্যর্থনা লাভ করিবার আশা লইয়া জয়া আসে নাই। সে যে প্রয়োজনে আসিয়াছে তাহা সমাধা করিতে লাগিল—

বিভূতি সেই জুতা লইয়া যায় নাই। তাহারই এক পাটি হাতে করিয়া লইয়া আসিয়া জয়া উঠানে নামিল, এবং মাথায় করিয়া স্থির হইয়া দাড়াইল।

ছায়া তাহার দেহের সমান দীর্ঘ হইয়া মাটিতে পড়িল।

মস্তকে পাদুকা ধারণ অন্তরালবর্ত্তিনা বধূ-দুটির চোখে পড়িল। মুচ্‌কি হাসিয়া বড়বধূ বলিলেন, দেখে আসি। বলিয়া তিনি উঠানে আসিয়াই জয়ার দিকে চাহিয়া বিমর্ষ মুখে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, ও কি লা?

অনভ্যস্ত পথশ্রমে আর রৌদ্রের উত্তাপে জয়ার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল। দুটি পায়ের তলায় বিস্ফোটকের জ্বালার মত একটা প্রদাহ যেন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

জয়া কথা কহিল না।

বড়বৌ বলিলেন, তাঁরা তো কেউ নেই এখানে, কাশী গেছেন। ও তোমার বৃথা হ'চ্ছে, ভাই।

বড়বধূর কণ্ঠ সুমিষ্ট, কিন্তু জয়া কথা কহিল না। বড়বৌ বলিলেন, এই ঘরের বউ, এতখানি পথ বে-আব্রু হ'যে হেঁটে এলে। তোমার বড ভাসুর উপস্থিত থাকলে আহ্লাদে বোধ হয় নাচতেন। তা এলে এলে। এলে, পা-হাত ধোও, মুখ শুকিয়ে গেছে। কি জানি বাপু, তোমাদের ক'ল্‌কাত'র রকম। চিরটা কাল তোমার নাটুকে ঢঙই দেখে আস্‌ছি !

বড়বৌ চুপ করিলেন।

জয়া তথাপি কথা কহিল না।

বড়বৌ আবার বলিলেন, আমাদের দোষ নেই বাপু। আমাদেব ঘা'ট তো পদে পদে। ভাসুরকে যে লাগাবে, তা' হবে না। তখন আমরা বলব যে, আমাদের কথা শুনলে না। তারপর হঠাৎ গিরিবালার কথা মনে পড়ায় বলিলেন, গিরিই হয়েছে আস্ত হারামজাদি। বলিয়া বড়বৌ যে দিক হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিকেই প্রস্থান করিলেন।

শিশির ইত্যবসরে পুকুরে হাত-মুখ ধুইয়া একবার দিদির তল্লাসে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দিদির অবস্থা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, এবং এখানকার বর্ত্তমান কুটুম্বিতা সুবিধাজনক নহে মনে করিয়া ষ্টেশনে পলাইয়াছিল, তাহার খোঁজও কেহ করিল না।

ওঁরা স্নান করিলেন। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল পরিপাটী করিলেন। খাইতে যাইবার সময় দু'-জায়েই ডাকিয়া গেলেন, ন'বৌ, চান করো, খাও। বলিয়া কিন্তু বিশেষ দাঁড়াইলেন না।

ন' বৌ কিন্তু নড়িল না।

ওঁরা নিজেদের নিষ্কলুষ অন্তরের সাক্ষীস্বরূপ ন'বৌয়ের উদ্দেশে ভাত-তরকারি বাড়িয়া ঢাকিয়া রাখিলেন—কেহ অনুযোগ করিলে তাহার চোখ ফুটাইয়া দিবেন। তারপর আহারান্তে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

দণ্ডায়মানা জয়ার ছায়া গুটাইয়া ক্রমে ক্ষুদ্রতর হইতে হইতে পায়ের তলায় জড়ো হইল।

ওঁরা সুশীতল কক্ষতলে দেহ ঢালিয়া দিয়া অচিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কেবল গিরিবালা দু'হাতে জানালার গরাদে ধরিয়া খুড়ীমার দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া জাগিয়া বসিয়া রহিল।

পদতলের ক্ষুদ্র ছায়া পুনরায় দীর্ঘতর হইতে লাগিল।

পাখীরা গাছের পাতার ভিতরে ঢুকিয়া বসিয়াছে, কিন্তু উপরের পাতাগুলি যেন জ্বলিতেছে। একখানা ঘরের খড় ফেলিয়া দিয়া কাঠের ফ্রেমে সম্প্রতি টিন বসান হইয়াছিল—টিনের চাল তাতিয়া লাল হইতে কেবল বাকি আছে। বাতাস এদিকে বহিতেছে তাহারই উপর দিয়া।

গিরিবালা বসিয়া থাকিতে থাকিতে একবার হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল, পালাও। হাত নাড়িয়াই সভয়ে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, মা দেখে নাই, ঘুমাইতেছে।

গিরিবালা উঠিল। পা টিপিয়া টিপিয়া যাইয়া অপর কিছুর অভাবে, এক এক করিয়া চারখানা বাঁধান বই আনিয়া চৌকাঠের কাছে পাতিয়া তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রাণপণে হাত বাড়াইয়া, আঙ্গুলে

ভর দিয়া দাঁড়াইয়াও তাহার হাতের আঙুল ছিট্‌কিনি পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। দু'খানা কাপড় ভাঁজ করিয়া বইয়ের উপর পাতিল, কিন্তু তাহাতেও কুলাইল না।

বই আর কাপড় যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া গিরিবালা আবার জানালার ধারটিতে ছল ছল চক্ষে আসিয়া বসিল।

ন' খুড়িমা তখনো তেমনি দাঁড়াইয়া আছে।

পাদুকা মাথায় লইয়া জয়া প্রথম যখন দাঁড়াইয়াছিল, তখন দেহে যন্ত্রণা তার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু মনে ছিল না। তারপর শরতের এক খানা লঘু মেঘও সূর্য্যের অগ্নিরশ্মি অবতরণের পথ দিয়া ভাসিল না—ছায়ার বিন্দুও তার চোখে পড়ে নাই।

জয়ার চক্ষু লাল হইয়া বৃহত্তর হইতে হইতে জ্বালা করিয়া ক্রমশঃ স্তিমিত ও আবিল হইয়া আসিতে লাগিল।

গা দিয়া ঘামের যে স্রোত বহিতেছিল প্রথমে তাহা গাত্রাবরণের মাঝে অদৃশ্য হইতেছিল। পরে ঘামের ধারায় সর্ব্বাঙ্গে বার'বার শিহরণ জাগিতে লাগিল। প্রথমে চুল হইতে চিবুক পর্য্যন্ত মুখটি দুর্ব্বিত ভাবগ্রস্ত হইয়া পরে কেবল চুলের নীচে খুলির হাড়টা টাটাইতে লাগিল।

উত্তপ্ত টিনের উপর বায়ু কাঁপিয়া মরীচিকার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জয়ার চোখে পড়িল না।

ছায়া দক্ষিণ দিকে দীর্ঘতর হইয়া বারান্দা স্পর্শ করিল এবং খুড়ীমার দিকে চোখ রাখিতে রাখিতে গিরিবালা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল

—মা ওঠো, শিগ্‌গীর দরজা খোলো,—খুড়ীমা পড়ে' গেছে। বলিয়া জানালার ধার হইতে নামিয়া সে একলাফে দরজার কাছে আসিল।

গিলিবালাব মা হবিপ্রিযাব ঘুম পুর্ব্বেই ভাঙ্গিয়াছিল। তাডাতাড়ি উঠিবাব দবকাব নাই, বলিয়া তিনি চোখ বজিযা পডিযা থাকিযা আলস্যটা উপভোগ কবিতেছিলেন। ন' বৌযেব কথা তাব মনেই ছিলনা।

গিবিবালাব চীৎকাবে তিনি উঠিযা পডিলেন। দবজা খুলিতেই গিবিবালা তাহাকে ঠেলিযা দিযা সর্ব্বগ্রে ছুটিয়া বাহিব হইল।

হবিপ্রিযা উঠানে শাযিত শ্বেতবস্ত্র পটিব দিকে চাহিয়া গিবিবালাকে শুধাইলেন, তুই বঝি ঘুমুস নি?

শিববতন স্বভাবতঃ সাধু, সবল এবং সাহসী লোক, কিন্তু গাড়ীব জানালা দিযা মুখ বাডাইযা, বাড়ীব ষ্টেশনটি কুযাশাব এবং উষার অন্ধকাবেব ভিতবে অস্পষ্ট চোখে পডিতেই তাব গৃহে পৌছিবাব আগ্রহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইযা অকাবণেই বুক ডুক ডুক কবিতে লাগিল।

জননীব আদেশ তিনি আজন্ম পালন কবিযাছেন, তিনি নিজে অনুজ এবং অনুগত জনকে যে আদেশ কবিযাছেন, তাহা এত দিন নিঃশব্দে অক্ষবে অক্ষবে প্রতিপালিত হইযাছে।

কিন্তু আজ তাহাব আদেশ লঙ্ঘিত হইযাছে, এবং সেই সূত্রে জননীকে লইযা যে সঙ্কট আব কঠিন বেদনাব সৃষ্টি হইযাছে, শিববতনেব মনে হইতে লাগিল, সে দুটিব একটিবও পাব নাই, পাব হইবাব সাধ্যও তাব নাই। জননীকে তিনি একটা প্রতিশ্রুতি দিয়া ফিবাইযা আনিযাছেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি বক্ষা কবিতে ইহাব পবও তিনি সমর্থ কি। যে শৃঙ্খলা এবং প্রভাবেব উপব সংসাব ধৃত ছিল, একটিমাত্র চ্যুতিতে তাহা কি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় নাই।

ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়াইল। জননীকে লইয়া শিবরতন ট্রেন হইতে অবতরণ করিলেন। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই।

শিবরতন গাড়ীর তল্লাসে যাইবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় ষ্টেশন-মাষ্টার অতুল বাঁড়ুয্যে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজাইবার হুকুম দিয়া ছুটিয়া আসিয়া হাসিমুখে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

—আপনি কোত্থেকে আসছেন?

শিবরতনের জবাব ছিল না। একটু হাসিলেন—

অতুল মাষ্টার শিবরতনের পরিচিত লোক—উৎসাহী ছোকরা। শিবরতনের হৃদয়বত্তার প্রতিদানের সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া বলিতে লাগিল, মা বুঝি সঙ্গে রয়েছেন। প্রণাম করে' আসি। বলিয়া প্রণাম করিয়া আসিল।

বলিতে লাগিল, মা যাবেন কিসে। গাড়ী তো নেই, একটা কথা বলি---

শিবরতনও তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। বলিলেন, বলুন।

মা আমার বাসায় ততক্ষণ বিশ্রাম করুন না। আপনি গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিন গে। কেমন?

শিবরতন বলিলেন, তা ছাড়া ত আর উপায় দেখি নে।

ষ্টেশন-মাষ্টার বহু সমাদর করিয়া এবং কারণে অকারণে পুনঃ পুনঃ মাতৃ সম্বোধন করিয়া রাসেশ্বরীকে লইয়া তাহার অন্তঃপুরে বসাইল।

শিবরতন ষ্টেশনের ফটক পার হইয়া, অশ্বত্থ বৃক্ষের পাশ দিয়া, বাঁধান কূপটি বামে রাখিয়া অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শম্ভুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিভূতিকে সস্ত্রীক বাড়ী পৌঁছিতে জরুরী তার করিতে হইবে। এই কথাটাই তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারংবার চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলেন, সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনিতে চমকিয়া চোখ তুলিয়া দেখিলেন, ডাক্তার কিশোরী রায় হাত দশেক দূরে সাইকেল হইতে নামিয়া সিটের সঙ্গে আবদ্ধ বস্ত্র টানিয়া ছাড়াইতেছে।

ডাক্তার বলিল, আপনি এসে' পড়েছেন! ভালই হয়েছে।

—কেন বল তো? বলিয়া শিবরতন দাঁড়াইলেন।

কিশোরী বলিল. আমি আপনাদের বাড়ী থেকেই আসছি এখন, সারারাত জেগে।

শিবরতন শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

ডাক্তার বলিতে লাগিল, ভয় কেটে' গেছে।

—অসুখ কার?

—ন' বৌদির।

—ন' বৌমার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি অসুখ?

শুনলাম, তিনি বাপের বাড়ী থেকে এসে সমস্ত দুপুরটা এক পাটি জুতো মাথায় করে' উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সমস্ত দিন জলস্পর্শ করেন নি!

শিবরতনের মাথার ভিতর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল।

—তারপর?

—থাকতে থাকতে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যান।

কি প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া ডাক্তার সঙ্কটাপন্ন রোগিণীকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে তাহাও বোধ হয় প্রকাশ করিত, কিন্তু শিবরতনের আর সবুর সহিল না। সুখ দুঃখের অগাধ প্লাবন একসঙ্গে তাঁর বুকে বহিতে লাগিল। তিনি বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

(৪)

ব্যাপারটা সকলের কাছে খুব বৃহৎ বলিয়া বোধ হইলেও, আসলে ন'বৌয়ের বিশেষ কিছুই হয় নাই। হয়ত সারারাতের ট্রেনের কষ্টের পর বহুক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকাতে তাহার স্নায়ুমণ্ডলী অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, হয়ত প্রখর রবিতাপে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং সর্ব্বদেহে কোন সাড়া ছিল না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, দৈহিক অসুস্থতা যতই কেন হউক না, তাহার মনোবেদনার আর অন্ত ছিল না; এবং অন্তরের সেই সুতীব্র বেদনা দৈহিক অত্যাচার ও ক্লান্তির সহিত মিশিয়াই তাহাকে খানিক ক্ষণের জন্য হতচৈতন্য করিয়া দিয়াছিল।

শিবরতন ইহা লইয়া আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই, বা এই ব্যাপার লইয়া একটা আন্দোলন করিবার অবসরও কাহাকেও দেন নাই। গিরিবালা একটিবার তাঁহার কাছে বলিতে আসিয়াছিল, ন'কাকার একপাটি জুতো দু'হাতে মাথায় ধ'রে, সেই দুপুর রোদে, বাবা—কিন্তু বাবার এক ধমক খাইয়া দুপুর রোদের কাহিনীটা আর

সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। মাতাও একবার ঠিক পুত্রকে সম্বোধন করিয়া না কহিলেও, তাঁহার সাক্ষাতেই আপন মনে বলিয়াছিলেন, কি রকম বউ বাপু! ভাসুর না হয় রাগের মাথায় বলেইচে! তাই বলে তুই কোলকাতা থেকে তাল ঠুকে ফিরে এসে—মেয়েমানুষের এ রকম জেদও ত—। মায়ের কথায় বাধা দান করিয়া শিবরতন কহিয়াছিলেন, থাক্ মা, ও সব কথা আর টেনে-বুনে বাড়াবার দরকার নেই। বলিয়া অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব দেখাইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

মৈত্র পরিবারের এত বড় একটা জটিল অধ্যায় যখন নানাপ্রকার শঙ্কা, সন্দেহ, উৎকণ্ঠা, মনঃপীড়া ও সর্ব্বশেষে নীরবতার মধ্য দিয়া একরূপ শেষ হইয়া আসিতেছিল, তখন আর এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইয়া সকলের পীড়িত অন্তঃকরণকে সেইদিকে সহসা টান দিল। রাসেশ্বরী হঠাৎ অতিমাত্রায় পীড়িত হইয়া শয্যা অধিকার করিলেন।

রাসেশ্বরীর আকস্মিক রোগশয্যা-গ্রহণ সকলের সকল প্রকার আবেদন, নিবেদন, অশান্তি, মন পীড়ার উপর যেন একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ বিছাইয়া দিল। কেন না, যেরূপ বয়সে যেরূপভাবে রাসেশ্বরী পীড়িত হইয়া শয্যাশ্রয় করিলেন এবং তাঁহার রোগের লক্ষণাদি দেখিয়া চিকিৎসকের চোখে মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই মন জুড়িয়া তখন নূতন আশঙ্কার ছায়া পড়িল।

যে ডাক্তারবাবুটি ন'রৌয়ের চিকিৎসার জন্য আসিতেছিলেন, তিনিই রাসেশ্বরীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যত কাটিয়া যাইতে লাগিল, রোগও তত নূতন নূতন উপসর্গ আনিয়া

চিকিৎসকের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে বিফল করিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে কার্ত্তিক মাসের নূতন ঠাণ্ডা রোগিণীর জীর্ণ বুকের হাড় কয়খানির মধ্যে ভাল করিয়া আশ্রয় লইল এবং তাহাই প্রধান উপলক্ষ্য করিয়া একদিন নিশান্তে পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতিনীগণের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া, রাসেশ্বরী এ সংসারের উপর হইতে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মাতার অসুখের সংবাদ পাইয়াও বিভূতিরতন কলিকাতা হইতে বাটী আসিতে পারে নাই। ছুটি না পাওয়া ও তাহার সঙ্গে প্রকাণ্ড অন্য এমন একটা কাজের অজুহাত সে জ্যেষ্ঠকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিল যে, তাহার উপর কাহারো কিছু বলিবারই ছিল না। কিন্তু এক্ষণে শ্রাদ্ধের সময় শ্বশ্রূ, শ্যালিকা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে চলিয়া আসিতে হইল এবং বাটিতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা শোক ও সন্তাপের ছায়া তাহার মুখখানাকে অধিকার করিয়া বসিল যে, কোন বিষয়েই কোন কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না। শুধু জয়া একদিন তাহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিল, এইবার? বিভূতি বিরসমুখে উত্তর করিল, এইবার ভাসুরের হাজার রকমের অপমান আরও ভাল ক'রে মাথা পেতে সহ্য কর। বাড়ীতে যার যত জোড়া জুতো আছে খুঁজে জড় কর, তারপর অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে ম'রে, এই বড় শ্রাদ্ধের পরেই আর একটা ছোটখাটো শ্রাদ্ধের যাতে যোগাড় হয়—

সব কথাটা বলিবার অবসর না দিয়াই, ন'বৌ বিরক্ত মনে অন্যত্র চলিয়া গেল এবং শুধু এইটুকু বলিয়া গেল, ভাসুরের অপমান নয়, তাঁর

আদেশ। শ্বশুর-ভাসুরের আদেশ পালনই করতে হয়। আর তোমার পায়ের জুতো, সে ত আমার মাথায় রাখবারই জিনিষ, মাথা পেতে যে তা নিতে পেরেছি, সে ত আমার সৌভাগ্য—পুণ্য।

ইহার দিন কয়েক পরেই যথাদিনে রাসেশ্বরীর শ্রাদ্ধ ঘটা করিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

মাতার প্রতি ভক্তি-ভালবাসার অসাধারণ আধিক্য হেতু শিবরতন তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে একটু বাড়াবাড়ি রকম ব্যয় করিয়া বসিলেন। বিরাজপুর গ্রামখানি নেহাৎ ক্ষুদ্র ছিল না। মৈত্রবংশের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে গিয়া ইহার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত গ্রামের জমিদারবাটী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য জোতদার কৃষক পরিবার পর্য্যন্ত সকল ঘরের সকলকেই শিবরতন মাতার শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করাইবার পক্ষে যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। আয়োজনের টান গ্রাম ছাড়াইয়া ভিন্ গ্রামের স্থানে স্থানে গিয়াও পৌঁছাইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রায় একমাসের মধ্যে আনন্দ ও নিরানন্দের দুইটি শ্রেষ্ঠ বিসর্জ্জনের পালা মৈত্র পরিবারে পর পর সম্পন্ন হইয়া গেল, একটি মা আনন্দময়ীর, অপরটি মা রাসেশ্বরীর।

অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে মহামায়ার পূজা অন্তে একদিন প্রভাতে চণ্ডীমণ্ডপের উপর সতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া তিন ভ্রাতায় যেমন সম্মুখে হিসাবের খাতা খুলিয়া খরচপত্রের আলোচনাদি করিয়াছিলেন, মাতৃ-শ্রাদ্ধের পরও একদিন সন্ধ্যায় সেইরূপ তিন ভ্রাতায় চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে বসিয়া সদ্যঃসমাপ্ত এই কার্য্যোপলক্ষে ব্যয়াদির কথা লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলেন। সেদিন শরতের প্রভাত-রৌদ্র সতরঞ্চির

উপর ও ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছিল, এ দিন হেমন্তের চন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঁকি দিতেছিল। রৌদ্রপীড়িত হইয়া সেদিন বসিবার সতরঞ্চখানি ছায়ার দিকে বারবার সরাইয়া লইলেও সকলের আননে স্বস্তি ও আরামের যে একটা শান্ত ভাব বিদ্যমান ছিল, আজ তাহার কিছুই ছিল না, তৎস্থলে বেদনা ও নিরানন্দের ছায়া সেখানে বিনাড়ম্বরে বিরাজ করিতেছিল।

অগ্রজের কি একটা কথার সূত্রে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বিভূতিরতন কহিল, তা হ'লেও এতটা খরচপত্তর করে ফেলা উচিত হয় নি। শাশুড়ী ঠাকরুণ বলছিলেন—

শিবরতন বাধা দিয়া কহিলেন, শাশুড়ী ঠাকরুণ কি বলছিলেন না বলছিলেন, আমার জানবার দরকার নেই। কাজ আমাদের শাশুড়ী ঠাকরুণের নয়।

বিভূতি ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে সম্মুখের সতরঞ্চি উপর আঙুলের ডগা দিয়া কি যেন লিখিতে লাগিল।

শিবরতন বলিলেন, বিভূতি!

—আজ্ঞে।

—খরচপত্তর কি বেশি হয়েচে বলে মনে কর?

—আজ্ঞে, বড্ড বেশি হয়েচে বলেই মনে হয়। এ সময় এতটা—

—বল কি বিভূতি? মা যে! এই ত আমাদের শেষ কাজ, এরপর আমি যখন চোখ বুজবো, তখন তোমরা শুধু তিলকাঞ্চন করে, দ্বাদশটি

ব্রাহ্মণ খাইয়েই কাজ সেরো। মার শ্রাদ্ধে যেটুকু করা হ'ল, এটুকু না করলে কি হয় কখনো? বুঝলে না?

কিন্তু বিভূতি বোধ হয় বুঝিতে পারিল না। কহিল, বুঝিছি, কিন্তু পূজোর অতবড় একটা খরচের পর আবার দেনা করে—

তা বলো কি হয়। আমি মনে করেছিলুম যে তুমি অন্ততঃ শ' পাঁচেক টাকাও এ সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। পূজোর খরচটা ত শম্ভু আর আমিই চালালুম। সংসারের ত'বিলে ত আর একটি পাইপয়সাও নেই।

বিভূতি একটুখানি ঢোক গিলিয়া বলিল, আমিও সেই কথাই বলচি এই দেখুন না কেন, শুধু শুধু কাশী যাবার হাঙ্গাম করে এক কাঁড়ি টাকা খরচ পত্তর হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, কিন্তু মা যখন অত করে জিদ ধরলেন, তখন—মনে মনে শিবব্রতন ভাবিলেন, যে, বিভূতি তাহার সম্মুখে বসিয়া খরচপত্র লইয়া এরকম ধরণের প্রশ্ন ইহার পূর্ব্বে বড় একটা করে নাই। ইদানীং কিছুদিন হইতে বিভূতির এইরূপ ভাবান্তর শিবব্রতন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। কয়েকদণ্ড চুপ করিয়া থাকিবার পর ভৃত্যকে তামাকের জন্য একটা হাক দিয়া, শম্ভুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তুমিও শম্ভু, একটু চেষ্টা চরিত্তির করে দেখ, তোমার কোর্টের কোন উকীল বন্ধু টন্ধুর কাছ থেকে উপস্থিত টাকাটা যোগাড় করতে পার কি না। সেরেস্তার টাকাটা খরচ ক'রে বসলাম, মাস খানেকের মধ্যে টাকাটা যোগাড় না হোলে ত মহাবিপদে পড়তে হবে দেখচি।

এদিনেও শম্ভুব্রতন একটা মোটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া সতরঞ্চের

একধারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চুপ্ করিয়াই প'ড়য়াছিল, জ্যেষ্ঠের কথায় শুধু একটু নড়িয়া উঠিল মাত্র।

ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। কিন্তু অগ্নিগর্ভ কলিকা গড়গড়ার মাথার উপর শুধু শুধুই চাপিয়া রহিল, এবং তাহার ভিতরেব তামাক বৃথাই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

শিবরতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বারকতক অন্যমনস্কের মত পায়চাবি করিয়া বিভূতির উদ্দেশে কহিলেন, কোলকাতা গিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখো; কোন রকমে টাকাটা এঁর ভেতর যোগাড় তো করতে হবে। তোমারি ওপর এটার বেশি ভরসা। তুমি এখানে তা'হলে আর দেরী না করে কালই চলে যাও। ওঁদেরও সব নিয়ে যাও, শুধু ন'বৌমার এখন যাওয়া হবে না। ভাঙ্গা নৌকোর হাল, মা ছাড়া আর কারুর ধরবার শক্তি নেই

বিভূতি নিরুত্তরে বসিয়া বহিল এবং শম্ভু আর একবাব গা নাড়া দিয়া উঠিল।

ইহারই ঘণ্টাখানেক পরে বাটীর ভিতরকার পশ্চিম দিকের বড ঘরখানির মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বিভূতি তাহার শ্বশ্রূ ও শ্যালিকাব সহিত অনুচ্চস্বরে কথা কহিতেছিল। শিশিরও একটি কোণ ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল। সহসা বন্ধ দুয়ার বাহির হইতে ঠেলিয়া ন'বৌ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাপাকণ্ঠে মাতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কুটুমের বাড়ীতে এসেছ মা, এখানে আর এখন কোন কিছু গোলমাল বাধিও না। যা' তোমার বলবার কইবার বাড়ী গিয়ে সব বোলো

কোয়ো। জামাই ত তোমারি হাতের ভেতর। মৎলব পরামর্শ যা' দেবার সেখানে গিয়েই দিও। তবে, এ সংসার ছেড়ে এখন আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।

মাতা পরম বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুই বলিস কি লা জয়ী? ভাসুরের হুকুমে এইবার বুঝি মেথরের টব মাথায় করবি ব'লে এখানে পড়ে থাকতে চাইছিস্?

—হ্যাঁ, তাই চাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে ব্যাগ্‌গতা করি মা, রাত পোহালে ত সব চলে যাচ্ছ, আজ আর এই সব নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি বাধিও না।

—তুই তা'হলে এইখেনেই ঝাঁটা-লাথি খেয়ে থাকবি, যাবি নি ত?

—না, বলিয়া ন'বৌ যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে দরজা ঠেসাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিভূতি শ্বশ্রূর দিকে চাহিয়া কহিল, দেখলেন ত, ওর ধরণ-ধারণই আলাদা! ভাসুর যেন ওর কাছে স্বর্গের দেবতারও বাড়া! ভাসুর বলেছে এখানে থাকতে, সুতরাং সে কথার লঙ্ঘন করতে ও কি আর পারে!

সুদীর্ঘ একটি খেদের শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিভূতির শ্বশ্রূ কহিলেন, থাক্ বিভূতি। ও যখন কিছুতেই যাবে না, তখন এইখানেই থাক। ওর কপালে দেখচি অনেক দুর্গতিই আছে। চল বাবা, আমরা তা'হলে কালই চলে যাই। তারপর সেখানে গিয়ে যা হয় বিলি বন্দোবস্ত একটা করা যাবে এখন। ও মেয়ে কি সোজা মেয়ে বাবা, ছেলেবেলা থেকেই ও যেন কেমন এক ধরণের।

বিভূতির ছোট শালী কি যেন বলিতে গিয়া মাতার সুতীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে কথার মধ্যেই থামিয়া গেল এবং সেই কথাটাই কন্যার মুখ হইতে যেন কাড়িয়া লইয়া মাতা কহিলেন, বিষয়টা কেনা তা'হলে ত এবার হ'ল না, কেমন বাবা ?

বিভূতি কহিল, না মা, এ ক্ষেপে আর হল না। তার চিঠি পেয়ে টাকাটা আমি সঙ্গে করেই ত এনেছিলুম। কিন্তু হঠাৎ যে তার ব্যায়রাম হয়ে পড়বে, তা কে জানে। যাক—ফিরে ক্ষেপে এসেই হবে।

শিশির এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কহিল, মা, এই টাকা থেকে তো বড়দাদাবাবুকে সাত শ' টাকা দিয়ে দিলেই—

মধ্যপথেই তাহাকে একটা ধমক দিয়া মাতা কহিলেন, থাম শিশির। খবরদার এ টাকার কথা যেন বাইরে কারুর কাছে গল্প করিস্ না।

হঠাৎ এই সময় উঠান হইতে শিবব্রতনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, ন' বৌমা। সঙ্গে-সঙ্গেই বিভূতি ঘর হইতে নিঃসাড়ে বাহির হইয়া ওদিক দিয়া সদরের অভিমুখে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, চোখে মুখে জল দিবার পর বিভূতিব্রতন সদরে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, সম্মুখের খামারে কৃষাণ নূতন ধানের যে পালুই দিতেছিল, শিবব্রতন একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাই দেখিতেছেন। আগে হইলে বিভূতি দাদার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিভূতিকে দেখিতে পাইয়া শিবব্রতন ডাকিলেন তবে বিভূতি সেইস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবব্রতন কহিলেন, সকাল সকাল ঠিকঠাক

হয়ে নিও। বারুই-পুকুরে জগুকে পাঠিয়েছি, ছোট-খাট যা' হয় যদি একটা ধ'রে আনতে পারে।

বিভূতি নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পালুই দেওয়া দেখিতে লাগিল।

শিবরতন কহিলেন, পৌঁছেই পত্র দিও। আর টাকাটা গিয়েই পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো।

বিভূতি পূর্ব্ববৎ নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শিবরতন কহিলেন, হপ্তাখানেকের মধ্যে কোন রকমে পাঠাতে পারবে না?

বিভূতি কহিল, তাই ভাবচি। ওখানে খরচ বড্ড বেড়ে গিয়েচে। বাসাভাড়া জিনিষপত্র সবই দুর্ম্মূল্য। তারপর হাতে জমা টাকা—

—কি কিছু নেই নাকি?

—একটি পয়সাও নেই। তাই ভাবচি। সুদের লোভে কিছু টাকা একজনকে ধার দিয়ে ফেলেছি, কিছুতে সেটা আদায় করতে পারছি না। আচ্ছা, যাহোক ব্যবস্থা একটা করা যাবে এখন। অন্ততঃ এই সাত শ' টাকা যদি কোন জায়গা থেকে ধার-ধোর করেও—

—হ্যাঁ, অন্তত তাই ক'রেও পাঠিও। যেমন ক'রে হোক, সেরেস্তার টানাটা ফেলে দিয়ে এখন উদ্ধার হওয়া যা'ক, তারপর শম্ভুও চেষ্টা করুক, আমিও এদিক থেকে যদি কিছু করে উঠতে পারি; কি বল?

—আজ্ঞে।

অতঃপর জ্যেষ্ঠের সকাশ হইতে সশ্রদ্ধ পদবিক্ষেপে কনিষ্ঠ স্থানান্তরে প্রস্থান করিল এবং ইহারই ঘণ্টা তিন চার পরে আহারাদি সারিয়া

লইবার পর কাপড়-চোপড় পরিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে, জয়া ঢিপ্ করিয়া তাহার পায়ের কাছে গড করিয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, পৌঁছেই চিঠি দিও।

বিভূতি কহিল, ও ত পুরোনো কথা, চিরদিনই আছে। নূতন কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে যাই। অর্থাৎ, দিন কতকের ভেতরেই আমি আবার আসচি। বলিয়া প্রসারিত হস্তে বিভূতি জয়ার দিকে অগ্রসর হইতেই ত্রস্তে জয়া ঘাড় ফিরাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

(৫)

বিরাজপুর গ্রামখানির অন্য সব পাড়া হইতে ইহার উত্তরপাড়া একটু অসংলগ্ন এবং দূরবর্ত্তী, মধ্যে একটি সুবৃহৎ মাঠ। এই মাঠের উপর কোথাও উত্তরপাড়ার চাষাদের বেগুনক্ষেত, পাটক্ষেত, আখের-ক্ষেত, আবার কোথাও বা পতিত জমি, আমকাঁঠালের বাগান, বৈঁচিবন। কোথাও পায়ে-চলা পথের উভয় পার্শ্বে কালকাসুন্দে, নীল, ঝাঁটি প্রভৃতি বুনো গাছের ঝোপ-ঝাড়, কোথাও বা ছোট একটি পুরাতন চটান্ পুষ্করিণীর চারিদিকে ঘিরিয়া শিরীষ, তেঁতুল, ছাতিম, শিমুল প্রভৃতি বৃক্ষের কুঞ্জবন পুকুরের ফুটন্ত পদ্মগুলিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

একস্থানে পথের ধারে বহুকালের একটি শিব মন্দির মৃত্তিকায় লুকাইয়া পড়িয়াছে। তাহার দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের মাত্র একটুখানি অংশ পাশা-পাশি দুইটি ছোট কুলুঙ্গী বক্ষে লইয়া এখনো একধারে দাঁড়াইয়া আছে, বাকী তিন দিকের দেওয়াল এবং চূড়া আদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, তাহার ইটপাথরগুলি স্তূপাকারে ঘেঁটু-ফুলের বন বুকে ধরিয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই স্তূপের কিয়দংশ সাধারণের পথের উপরও আসিয়া জমা হইয়াছে এবং চিরকালের পথ তাহার পুরাণো অধিকার ত্যাগ করিয়া, সরকারদের বাঁশঝাড়ের গা দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। সেখানে খানিকটা স্থান একটু পরিষ্কার করা এবং সেই পরিষ্কৃত স্থানে পাথরের মত একটী দ্রব্য যাহা আছে তাহাই বোধ হয় মন্দিরের দেবতা। কারণ, উত্তরপাড়ার চাটুয্যে বাড়ীর ছেলেদের মধ্যে কেহ না কেহ প্রত্যহ সকালে এক

হাতে একটী গঙ্গাজলের ঘটি এবং আর এক হাতে বেকাবীতে করিয়া দু'টী ফুল-বিল্বপত্র লইয়া আসিয়া ঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দিয়া যায় এবং বিল্বপত্রের শূন্য রেকাবীখানি, যাইবার সময়, বৈঁচিবনের গোড়ায় গোড়ায় যে সমস্ত বন যুঁইয়ের ঝাড থাকে, তাহা হইতে ফুটন্ত বন-যুঁই তুলিয়া পূর্ণ করিয়া লয়।

বৈকালের দিকে শিশির এই পথে আসিয়া বন-যুঁইয়ের ঝোপগুলি আঁতি-পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া একটিও ফুল পাইল না। তখন সে মাঠের সেই পুকুরে পদ্মের সন্ধানে অগ্রসর হইল।

মায়ের সঙ্গে শিশিরের কালিকাতায় যাওয়া হয় নাই। কতকটা তাহার নিজের যাইবার ইচ্ছা ছিল না, এবং কতকটা জ্বরার পীড়া-পীড়িতে শিশির আরো কিছুদিন বিরাজপুরে থাকিবার আধিকার পাইয়াছিল এবং তাহার একঘেঁয়ে বৈচিত্র্যহীন কলিকাতা বাসের পর, পল্লীর এই অপূর্ব্ব নগ্ন শোভাসৌন্দর্য্য তাহার নয়ন-মনকে পরম পুলকে ভরাইয়া তুলিয়াছিল।

অনেক চেষ্টা করিয়া মাঠের সেই পুকুর হইতে কয়েকটি পদ্ম সংগ্রহ করিয়া সে বরাবর উত্তরপাড়ার পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল এবং ও-পাড়ার বারোয়ারীতলা ও ছিরু কামারের কামারশাল ছাড়াইয়া যাইতেই, যেখানে বাগচীদের খামারবাড়ীর প্রাচীন বাতাবি লেবুর গাছটা হেমন্তের রৌদ্র-সেবিত পথের উপর ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া-ছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পথের এ-পাশে একটি পুরাতন শ্রীহীন, একতালা পাকা বাটীর অন্দরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, ঠাকুমা!

বৃদ্ধা ঠাকুমা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরের রোয়াকে আসিয়া কহিল, নাতির যাওয়া হয় নি বুঝি? বেশ ভাই, থাক কিছু দিন আমাদের এই পাড়া গাঁয়ে, সহরে গিয়ে তবু গল্প করবে। পদ্মফুল কোত্থেকে আনলি ভাই? এখনি তুললি বোধ হয়? তাজা রয়েচে।

রোয়াকের উপর পা ঝুলাইয়া বসিতে বসিতে শিশির হাসিয়া কহিল, শিশিরের পদ্ম, ও কি শুখুতে পায়? বুড়ী কোথা ঠাকুমা?

ওই যে, পুঁটুলে ছিপ নিয়ে খিড়কীর ঘাটের ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে মাছ ধরচেন। তারপর জ্বরে পড়বেন এখন। শিবুকে একবার ডেকে দিস তো ভাই, ওটার একটা বিলিসিলি করে দিক, শ্বশুড়বাড়ী গিয়ে একটু জব্দ হোক। আইবুড়ো থেকে, এইরকম ধিঙ্গীগিরি কবে আর কদ্দিন বেড়াবে! ও কি, উঠছিস কেন?

না ঠাকুমা, যাই নি, বলিয়া শিশির খিড়কির বাহিরে, পুকুরেব ঘাটে, যেখানে বুড়ী মাছ ধরিতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই বুড়ী তাহার হাতের ফুলের দিকে চাহিয়া বলিল, মাঠের পুকুর থেকে তুলে আনলেন? আমাকে দিয়ে যেতে হবে কিন্তু। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নকারিণীর উৎসুক দৃষ্টি পুনরায় ছিপের ফাৎনার উপর গিয়া আবদ্ধ হইল।

শিশির একবার তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, জলের নেবে, না স্থলের নেবে, আগে সেটা ঠিক কর, দৃষ্টি ত জলের দিকেই।

ফাৎনার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া, বুড়ী শিশিরের মুখের পানে চাহিতেই, শিশির কহিল, একমনে যে মাছ ধরচ, কিন্তু মাছ কই?

দশ বারটা পুঁটী ধরেচি শিশির দা, একটা বেলে ধরেচি, ওই যে দেখুন না, ঘটীর ভেতর জল দিয়ে রেখেছি। একটা যা বড় মাছ চারে এসেছিল!

—তারপর কি হ'ল?

—পুঁটুলে ছিপ যে, নইলে ঠিক ধরতাম।

কিন্তু কপালের ওপর এতটা কাদা লাগলো কি করে?—বলিয়া শিশির একহাতে বুড়ীর কাঁধ ধরিয়া এবং অপর হাতে বুড়ীরই বস্ত্রাঞ্চল লইয়া তদ্দ্বারা তাহার কপালের সেই কাদা মুছিয়া দিতে দিতে কহিল, মুখখানা যে রোদ লেগে একেবারে রক্তবর্ণ হোয়ে উঠেচে!

সত্যই, হেমন্তের পড়ন্ত রৌদ্র বুড়ীর মুখে পড়িয়া তাহার সমস্ত মুখখানা রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছিল। বুড়ী কহিল, থাক, আপনাব কাদা তুলতে হবে না, কপালটা যে আমার একেবাবে গেল।

শিশির কহিল, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচ। ঠাকুমা কি শাস্তির ব্যবস্থা করচেন, জান ত? শীগ্‌গিরই একটা বর-টর খুঁজতে সুরু করা হবে।

যান!—বলিয়া বুড়ী মুখ ফিরাইয়া লইয়া তাহার ছিপ গুটাইতে আরম্ভ করিল!

মৈত্রবংশের সৌজন্য সাধুতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠার খ্যাতি যেমন গ্রাম উপ্‌-চাইয়া সহর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এ গ্রামের এই মেয়েটির রূপের খ্যাতিও সেইরূপ, সহর পর্য্যন্ত না হইলেও, আশ-পাশের গ্রামগুলির ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও একটি খ্যাতি এ বংশের ছিল। সাণ্ডেলদের এই পুরাতন, ভাঙ্গা নগণ্য ভিটাখানিরই উপর

এককালে না কি সুবৃহৎ চক্-মিলানো বাড়ী ছিল এবং ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ না কি তাঁহাদের অন্যান্য জমিদারীর সঙ্গে এ গ্রামেরও মালিক ছিলেন।

এই সাণ্ডেল পরিবারের সহিত মৈত্র পরিবারের পুরুষানুক্রমিক হৃদ্যতা। বিশেষতঃ বুড়ীকে এ বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত ভালবাসিত, বিশেষ করিয়া জয়া। বৎসর দশেক আগে সর্ব্বপ্রথম শ্বশুরবাটী আসিয়া জয়া, পিতৃমাতৃহীন এই অনিন্দ্যসুন্দর মেয়েটিকে অসীম স্নেহে বুকে করিয়া লইয়াছিল এবং তখন হইতেই বুড়ীকে জয়া আপন ভগিনীর মতই ভালবাসা ও যত্ন দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে।

কলিকাতায় প্রথম যখন শিশির, দিদির কাছে বুড়ীর নাম ও কথা শোনে, তৎপূর্ব্বে সে বিরাজপুর আসে নাই। তখন শিশির বুড়ীর সম্বন্ধে একটা অতি সাধারণ ধারণা করিয়া লইয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল, তাহাদের পাড়ার আর সব মেয়ে যেমন, ক্ষেন্তি, বুঁচি, কালী, টুকি, পটলী,—বুড়ীও তেমনি হইবে; তাহার পর বিরাজপুরে আসিয়া যেবার সর্ব্বপ্রথম বুড়ীকে দেখিল, সেবার পরম বিস্ময়ে সে মনে মনে বলিয়া উঠিল, বুড়ী এমন! তারপর হইতে দিদির সহিত সে বহুবারই বিরাজপুর আসিয়াছে।

সাণ্ডেলদের অভিভাবকও শিবরতন। কিছুদিন হইতে, বুড়ীকে পাত্রস্থ করিবার চিন্তা শিবরতনেরও চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। বুড়ীর বয়স চৌদ্দর উপর না যাইলেও, তাহার দৈহিক পুষ্টি ও পূর্ণতায় তাহাকে বেশি করিয়া বড় দেখাইত। কয় মাস হইতেই শিবরতন বুড়ীর জন্য পাত্র খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নানা কার্য্যের

ঝঞ্ঝাটে বাড়ী হইতে বাহির হইবার অবসর পান নাই। অবশেষে পূজার পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন যে, পূজার হাঙ্গামা চুকিয়া গেলেই তিনি এই কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন। কিন্তু পূজার পর হইতেই সংসারের উপর দিয়া যে সব ধাক্কা পব পর আসিতে লাগিল, তাহাতে তিনি সংসারের উপব হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, ক্ষণেকের জন্যও কোন দিকে চাহিবার মাত্র অবসর পান নাই।

সন্ধ্যার পর শিশির বাটী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শিবরতন একাকী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার সাবা মুখের উপর চিন্তার ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সাণ্ডেল বাটীর ঠাকুমার কথা বলিবার জন্য শিশির এ সময় তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করিল না। একটুখানি গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া সে বরাবর অন্দরে প্রবেশ করিল এবং যেখানে শয্যায় শায়িতা গিরিবালার মাথার ধারে বসিয়া ধীরে ধীরে জয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, কি হোয়েচে দিদি ?

জয়া বেদনাতুর কণ্ঠে কহিল, তুই ত কোন খবরই রাখিস না। মেয়ে কাল থেকে জ্বরে বেহুঁস হোয়ে পড়ে রয়েছে। তার ওপর আজ বিকেলে তক্তপোষের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মেয়ে কি আর আছে ! মাথা কেটে একেবারে রক্তগঙ্গা ! বাছা আমার একবারটি চোখ মেলতেও পারচে না। ডাক্তার এখন দেখে গেল, বট্‌ঠাকুরকে কি বলে গেল জানি না।

শিশির অপরাধীর মত শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

৬

রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে যেমন দৃশ্যের পর দৃশ্য দর্শকের মনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে, ৺দুর্গাপূজার পর হইতে শিবরতনের অন্তরমধ্যেও তেমনি নানাপ্রকার আগন্তুক ঘটনা ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্রমান্বয়ে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। মায়ের অপমান ও নালিশ, ন'বৌমার প্রতি কঠিন আদেশ, মাতাকে লইয়া কাশী যাত্রা, পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, ন'বৌমার আদেশ পালন করিতে গিয়া পীড়িত হইয়া পড়া, মাতার মৃত্যু, বিভূতির মনোভাব পরিবর্ত্তন, সর্ব্বশেষে কন্যা গিরিবালাকে লইয়া এই নূতন বিপদ, একটির পর একটি অবস্থা আসিয়া শিবরতনের অনভ্যস্ত অন্তরকে ক্ষুব্ধ ও পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয়, কলিকাতা হইতে বিভূতির পত্র। বিভূতি স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছে যে, টাকা এখন সেখান হইতে পাঠানো অসম্ভব, তিনি যেন অন্য উপায় করেন।

কিন্তু অন্য উপায় আর কিছুই ছিল না। তাই, কন্যার অসুখের জন্য নয়, কলিকাতা হইতে আজ কনিষ্ঠের এই পত্র পাইয়াই শিবরতন চিন্তাভারে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেলেও, চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে একাকী বসিয়া, শুধু নিজের মনে বার বার এই কথাটাই বলিতে লাগিলেন যে, সেই বিভূতিরতন আজ তাঁহাকে এই লিখিল! সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হইলেও আজ সে-কথা তাঁহার মনেই হইল না। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে জমিদারবাটী হইতে পনের দিনের ছুটি লইয়াছিলেন, তাহাও আজ শেষ হইয়া গেল; কাল হইতে সকাল সন্ধ্যা আবার

তাঁহাকে তথায় হাজিরা দিতে হইবে। এই জমিদারী-সেরাস্তায় হাজিরা দেওয়া সূত্রে যে-কথা তাঁহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল, তাহাতে অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিতেছিল।

৺দুর্গাপূজার ব্যয়ের পর তাঁহার হস্তে যৎসামান্য যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহা মাতাকে লইয়া কাশী যাওয়া উপলক্ষে খরচ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার শ্রাদ্ধের সময় তাহার হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না। গ্রামের কাহারো নিকট হইতে কর্জ্জ পাইবারও কোন সুবিধা সে সময় হয় নাই। তবে, একটা সুবিধা তখন হঠাৎ হইয়া গেল। জমিদারী-সেরেস্তা হইতে সাতশত টাকা জেলার ট্রেজারিতে জমা দিবার দরকার হয়। খাজাঞ্চীখানা হইতে শিবরতনের হাতেই টাকাটা দেওয়া হয় এবং তাঁহারই উপর ইহা জমা দিবার ভার পড়ে। টাকাটা জমা দিবার শেষ তারিখ অনেক পরে ছিল, সুতরাং শিবরতন তাঁহার এই সমস্যার সময় টাকাটা হাতে পাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। মনে ভাবিলেন, হরার দ্বারাই উপস্থিত কার্য্য সমাধা করা যাউক, তাহার পর শম্ভুর দ্বারাই হউক, বিভূতির নিকট হইতেই হউক, কিংবা অন্যত্র দেনা করিয়াই হউক, নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে জেলায় গিয়া উহা জমা দিয়া আসিলেই চলিতে পারিবে। কিন্তু যে-চাকা সহজেই চলিয়া যাইবে বলিয়া শিবরতন মনে স্থির করিয়াছিলেন, তাহাই এখন চলিতে গিয়া প্রতিপদেই বাধা খাইয়া আটকাইয়া পড়িতে লাগিল।

শম্ভুরতন তাহার কোর্টে বিশেষরূপ চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও কাহারও কাছ হইতে কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই। আজ বিভূতির এই

পত্র আসিল। গ্রামের কাহারও নিকট হইতে এমন অসময়ে টাকা কর্জ্জ পাইবারও কোন আশা নাই। ধান কাটার পর পৌষ মাঘ মাস হইলেও হইত। অথচ জেলার ট্রেজারিতে টাকা জমা দিবার শেষ দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় শিবরতন যে কি করিবেন, এই মহা সমস্যা-সাগরের মধ্যে কোন্‌খানে গিয়া যে কিনারার মাটি হাতে ঠেকিবে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে, একটা উপায় আছে। তিন বৌয়ের গায়ের গহনাগুলি জেলার কোন পোদ্দারের দোকানে বন্ধক রাখিয়া—; কিন্তু একথা মনে করিতেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তীব্র একটা জ্বালা ছড়াইয়া পড়িল। বউদের গা হইতে গহনা খুলিয়া এ কাজ তাঁহার দ্বারা কিছুতেই হইতে পারিবে না।

শিবরতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সন্ধ্যাহ্নিক করা বা পীড়িত কন্যাকে একবার গিয়া দেখিয়া আসার কথা ভুলিয়া সেইখানেই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে অন্যমনে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সংসারে বহু পরিজনের মধ্যে এমন একজন আছে, যাহার সতর্ক-দৃষ্টি সংসারেব সর্ব্বঅবস্থায় সর্ব্বদিকেই আবদ্ধ থাকে; তাহারই আদেশে ভিতর হইতে ভৃত্য আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকের নীচে দাঁড়াইয়া কহিল, ন'বৌমা সন্ধ্যা করতে বললেন।

পরদিন শিবরতন কয়দিনের পর জমিদারবাটীর কাজে বাহির হইলেন এবং বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বাল্য বন্ধু রাজেশ্বর তাঁহার অপেক্ষায় চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন। রাজেশ্বরের বাটী পার্শ্বের গ্রামে।

তিনি কলিকাতায় চিরকাল চাকুরী করিয়াছেন, সম্প্রতি কাজ হইতে অবসর লইয়া দেশে চলিয়া আসিয়াছেন।

কুশলপ্রশ্নাদির পর উভয় বন্ধুতে অনেক বেলা পর্য্যন্ত নানা-প্রকার কথাবার্ত্তা হইল। কথা শিবব্রতনের দিকেই বেশি, বিশেষ —পূজার পরের ঘটনাগুলির কথা। তারপর এখনকার যাহা শিব-ব্রতনের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি কথা, তাহাও বাল্য সখাকে জানাইতে বাকী রহিল না। সমস্ত শুনিয়া রাজেশ্বর কহিল, তাহলে ত' তোমার বিপদের উপর বিপদ যাচ্ছে, শিবু।

—সবই ত' শুনলে।

দুই বন্ধু ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর শিবব্রতনই কহিলেন, এখন ওঠ, স্নান টান করবে চল।

রাজেশ্বর উঠিলেন না। একটা উদ্বেগ ও চিন্তার ভাব তাঁহার মুখে বিরাজ করিতেছিল। কহিলেন, কিন্তু—

—কিন্তু কি ভাই?

—বলছি যে, ঘরের লক্ষ্মী ন'বৌমাকে জুতো মাথায় ক'রে দুপুর রোদে দাঁড়াবার আদেশটা দিয়ে ভাল করনি ভাই। এতে স্বয়ং মা-লক্ষ্মীর অপমান করা হোয়েচে।

—কিন্তু মার যে অপমান হোয়েছিল।

—না—না—তাঁর অপমান কিছুতেই হয় নি। ন'বৌমার দ্বারা তাঁর অপমান হওয়া কি রকম অসম্ভব জানো? পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের মত। ভুল ভাই, ভুল। তুমি এত হিসেবী হ'য়েও এত বড় একটা ভুল কেন যে হঠাৎ করে বসলে, তা বুঝতে পারচি না। মা বুড়ো

হোয়েছিলেন, তাঁর স্বভাব খিট্‌খিটে হোয়ে উঠেছিল, ভালমন্দ বোঝবার তাঁর শক্তি ছিল না। আমার বোধ হয়, বাড়ীর অন্য কেউ তাঁকে যেমন বুঝিয়েছেন, তিনি তাই বুঝেছেন।

—কিন্তু তাই কি ?—

—তাই ঠিক, শিবু। একে তুমি অতিমাত্রায় মাতৃভক্ত, তাতে সে সময় পূজোর হিসেব-পত্তর নিয়ে মেজাজের তোমার হয়ত ঠিক ছিল না, সেই সময় মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমার কাছে নালিশ জানিয়েছেন। তাঁর চোখে জল দেখে সঙ্গে সঙ্গে তোমারও অন্তর কেঁদে উঠেচে, আর—

—ঠিকই, তাই হোয়েছিল রাজু।

—আমিও তাই বলচি। তারপর মায়ের মনোবেদনা দূর করবার জন্যে নিরপেক্ষ বিচার করতে গিয়ে যা করলে, তাতে না হ'ল মায়ের মনোবেদনা দূর, না হ'ল নিরপেক্ষ বিচার। শুধু ন'বৌমার ওপর একটা অত্যাচার হ'ল। তা যাই হোক,—আমার কিন্তু মনে হয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ওপর এই অত্যাচার করাব জন্যেই সংসারে এই সব অনর্থ ঘটেচে। কোলকাতায় বিভূতির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। সামনে সে তোমার কাছে যেমনই দেখাক না, ভেতরে যেন একটু কেমন-কেমন ঠেকে বে ভাই।

রাজেশ্বরের কথায় আর কোন কিছু না বলিয়া শিবরতন নীরবে বসিয়া রহিলেন।

পরদিন সকাল সকাল জমিদার-সেরেস্তা হইতে গৃহে ফিরিয়া শিবরতন সকলের আগেই স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া লইলেন। শিশির

আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, কালকের চেয়েও আজ গিরিবালা ভাল আছে বড় দাদাবাবু, আজ সে উঠে বসে দিদির সঙ্গে কথা কইচে। আপনি কোন জায়গায় বেরুবেন না কি এখন ?

—হ্যাঁ রে ভাই, সেই টাকাটা জমা দেবার আর হপ্তাখানেক সময় আছে। আর ত চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, তাই একবার উঠে পড়ে চেষ্টা করে দেখি। এভাবে চেষ্টা করলে, অবিশ্যি যেখান থেকেই হোক টাকাটার যোগাড় আমি করতে পারবই, কিন্তু শিবু মৈত্রকে শেষকালে নিজে হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা নিতে হবে। এতটা যে শেষ পর্য্যন্ত করতে হবে, সেটা মনে ভাবি নি,—বলিয়া শিবব্রতন পিরাণের উপর চাদরখানা ফেলিয়া, অস্ফুটে দুর্গানাম উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর কার্ত্তিকের নির্ম্মেঘ আকাশের রঙ হঠাৎ বদলাইয়া গেল। অত্যন্ত অসময়ে হেমন্তের সারা আকাশে সহসা মেঘরাশির সঞ্চার হইয়া, ঈশানকোণ হইতে প্রবলবেগে জলো হাওয়া বহিতে সুরু করিল। দেখিতে দেখিতে সেই বাতাসের বেগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই ভীষণ বাত্যা আসিয়া শান্ত প্রকৃতিকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া প্রকৃতির উপর অকালের ঝড় যেন তাণ্ডব নৃত্য নাচিয়া গেল এবং তাহারি ফলে ঝটিকান্তে সমগ্র ধরণী আচম্বিতে যেন স্তব্ধ হইয়া পড়িল। জীবজন্তুর কোনদিকেই আর কোন সাড়াশব্দ রহিল না।

গৃহে পৌঁছিবার সামান্য পথ থাকিতেই শিবব্রতন ঝড়ের মধ্যে

পড়িয়াছিলেন এবং অতিকষ্টে দ্রুতপদে পথটুকু চলিয়া আসিয়া চণ্ডী-মণ্ডপের পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

জল-স্থল, পথ-ঘাট, কানন-প্রান্তর, বৃক্ষ-লতা, বাড়ী-ঘর লইয়া দানবী খেলা খেলিয়া, আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘরাশিকে তাড়াইয়া দিয়া যখন ভীষণ ঝটিকা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। তখনো শিবরতন ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে নিঃসাড়েই বসিয়া রহিলেন; উঠিয়া বাটীর মধ্যে যাইবার কথা যেন তাঁহার মনেই হইল না। বাটীর মধ্য হইতেও কাহারো কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। ঝটিকাস্তব্ধ প্রকৃতির মত শিবরতনের বহুপরিজনপরিবৃত সুবৃহৎ বাটীর সর্ব্বাংশ স্তব্ধ হইয়াই ছিল।

বাহিরে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশ ও পৃথিবীর গম্ভীর স্তব্ধতার ভিতর কোথাও একটু আলোকের আভাস মাত্র নাই। বাহিরের বাত্যা থামিয়া গেলেও, শিবরতনের মনের মধ্যে যে বাত্যা বহিতেছিল, তাহা থামে নাই। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আঁধার গৃহতলে মূঢ়ের মত অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া থাকিবার পর, সহসা কাহার কণ্ঠস্বরে শিবরতন চমকিত হইয়া উঠিলেন, মুক্ত-দুয়ারের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া কহিলেন, কে?

—আমি শিশির।

—কি বলছিস ভাই?

—আপনি টাকার যোগাড় করতে পেরেচেন?

—না রে ভাই, তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল না। তোর পেছনে ও কে দাঁড়িয়ে রে?

—ও বুড়ী। ঠাকুমা আজ এসেছিলেন; ঝড় এসে পড়ল বলে,

দিদি ওদের আজ আর যেতে দেয় নি। বলিয়া শিশির সেই আব্‌ছা অন্ধকারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং রুমালে বাঁধা পুঁটলি শিবরতনের কোলের উপর রাখিয়া কহিল, দিদি এইটে আপনাকে নিতে বল্‌লে, এতে হাজার টাকার নোট আছে।

পুঁটলিটা হাতে লইয়া শিবরতন সোজা উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, ন'বৌমা? ন'বৌমা দিলেন?

—হ্যাঁ। দিদি এই যে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েচে। কে যায় রে? বিষ্টু? হ্যারিকেন্‌টা হাতে করে ভট্‌চায্যি বাড়ী থেকে জামাইবাবুকে নিয়ে আয় না! ঝড়ের জন্যে বোধ হয় সেখানে আটকে পড়েচেন?

—কে, বিভূতি? বিভূতি এসেছে?

—হ্যাঁ দুপুরবেলা আজ এসেচেন।

শিবরতনের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। শুধু একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া স্তব্ধ গৃহের রুদ্ধ বাতাস ও সূচিভেদ্য আঁধার-রাশির মধ্যে মিশিয়া গেল।

৭

আহারের সময় উত্তীর্ণপ্রায়। বাটীর ভিতর হইতে বার দুই তাগিদ আসিল। কিন্তু শিবরতন উঠিতে পারিলেন না। কারণ, ছোটবাবু এখনো ফিরিয়া আসেন নাই। বিষ্ণু হ্যারিকান লণ্ঠন হাতে লইয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে বসিয়া আছে, তথাপি শিবরতন ব্যস্ত হইয়া পুনরায় যোগীনকে পাঠাইলেন।

রাত্রি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বিভূতির ফিরিতে যতই বিলম্ব হইতেছে, শিবরতনের অপেক্ষা শম্ভুরতন আরও বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। কারণ, অন্য যে কোনো কাজেই বিলম্ব হউক না কেন শম্ভুরতন তাহা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুধার সময় আহারে বিলম্ব তার একেবারেই অসহ্য। মৈত্র পরিবারের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বাবুরা একত্র হইয়া একই সময়ে দুটি বেলা আহারাদি করেন। বিভূতি যদিও কলিকাতায় থাকে; তথাপি দেশে আসিবামাত্র তাহাকেও এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়।

যোগীন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে ছোটবাবু আজ ভট্টাচার্য্য গৃহেই আহার করিবেন। সেখানে তিনি দাবা খেলায় মাতিয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন, আপনারা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবেন না।

কথাটা শুনিবামাত্র শম্ভুরতন উঠিয়া পড়িল, দাদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, চলুন, খেয়ে নেবেন; রাত হয়েছে। আপনারও যেমন গেরো! মিছে আমরা 'হা-পিত্যেশ্' ক'রে বসে রইলুম এতক্ষণ! গোড়ায় যদি বিষ্ণুকে দিয়ে বলে পাঠাতো তা'হ'লে আর হুঁঃ!.....

শিবরতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে

অগ্রসর হইলেন। যাইবার পথে গম্ভীরকণ্ঠে শম্ভুকে বলিলেন, শুধু একসঙ্গে তিন ভাই খেতে বসবো বলেই আমি তার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে বসেছিলাম না শম্ভু, বিভূতি আজ আমাদের বংশের মানমর্য্যাদা রক্ষা করেছে, আমাকে জেলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। একবার ভেবে দেখো দেখি টাকাটা যদি না সে ঠিক সময়ে নিয়ে আসতে পারতো, তাহলে আমাদের সমস্ত মানসম্ভ্রম একেবারে ধূলিসাৎ হ'য়ে যেতো!

শিবব্রতন আজ অনেকদিন পরে যেন তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। গত কয়েকদিন হইতে দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় যে তাঁর আহার নিদ্রা ভালরূপ হয় নাই এ খবরটা সংসারের আর কেউ জানুক বা না জানুক জয়ার নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। জয়া মনে করিয়াছিল একমাত্র আদরিণী কন্যা গিরিবালার কঠিন পীড়ার জন্যই বোধ হয় শিবব্রতনের মনের অবস্থা ভালো নাই। কিন্তু, গিরিবালার রোগশয্যায় বসিয়া যেদিন শিশিরের মুখে ভাসুরের আসন্ন বিপদের কথা শুনিল সেদিন হইতে জয়াও আর ভালো করিয়া খাইতে ও ঘুমাইতে পারে নাই। অনেক ভাবিয়া সে একদিন শিশিরকে নিরিবিলিতে ডাকিয়া বলিল, একটা কাজ ক'রতে পারবি ভাই?

শিশির তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, কেন পারবো না? কী কাজ কর'তে হবে দিদি?

জয়া বলিল, কাউকে বলবি না বল্? খুব চুপি চুপি ক'রতে হবে কিন্তু!

শিশির ইহাতেও সম্মত হইল। তখন জয়া বলিল,আমার গহনাগুলো কোথাও বন্ধক রেখে আমাকে সাতশ' টাকা এনে দিতে পারবি ?

শিশির স্বপ্নেও ভাবে নাই যে তার দিদি তাহাকে এরূপ একটা গুরুতর কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিবে। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু তা করবার প্রয়োজন কি দিদি। জামাইবাবুর হাতে যথেষ্ট টাকা আছে, তুমি ত' তাবে একখানা চিঠি লিখলেই পেতে পারো।

জয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, তোর কাছে আমি পরামর্শ চাইতে আসিনি। যা বললাম পারবি কিনা বল ?

দিদির কঠিন কণ্ঠস্বর শুনিয়া শিশির একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তার এই অযাচিত উপদেশের কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল তুমি বোধ হয় জান না তাই রাগ ক'রছো, জামাইবাবু গেলো বারে নিতাই চক্রবর্ত্তীর লাখরাজ সম্পত্তিটা কেনবার জন্য তিন হাজার টাকা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু নিতাই অসুখে পড়ায় রেজেষ্টারী অফিসে যেতে পারলে না ব'লে সেবারে আর বিষয়টা কেনা হল না, কিছু টাকা শুধু বায়না হিসাবে জামাইবাবু চক্রবর্ত্তীকে দিয়ে গেছেন। আমি ত' সেই সময় জামাইবাবুকে বলেছিলাম যে ওই টাকা থেকে উপস্থিত সাতশো টাকা বড়দা'কে দিয়ে যান না।

জয়ার মুখে চোখে নিমেষের জন্য যেন একটা আগ্রহ ফুটিয়া উঠিতে দেখা গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই তা' আবার পাষাণের মতন কঠিন হইয়া উঠিল। অত্যন্ত ধীর গম্ভীরকণ্ঠে সে শুধু প্রশ্ন করিল, তোমার ও প্রস্তাবটা নিশ্চয়ই তাঁর ভালো লাগে নি ?

শিশির তাড়াতাড়ি বলিল, না না, জামাইবাবু কোনো কথাই বলেন নি, তিনি চুপ করে রইলেন, বোধ হয় একটু নিমরাজিও ছিলেন, কিন্তু, মা তাঁকে কিছুতে দিতে দিলেন না। আমাকে শুদ্ধ চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে দিলেন যে খবরদার যেন এ টাকার কথা আমি কাউকে না বলি।

জয়া এ কথা শুনিবার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁ। তাহ'লে টাকাটা তুই আমার গহনা বাঁধা রেখে জোগাড় করতে পারবি নি?

শিশির হাতজোড় করিয়া বলিল, না দিদি, আমাকে মাফ্ করো।

এই ঘটনার দিন দুই পরেই—বিভূতিরতন বাড়ী আসিয়াছে। জয়ার সঙ্গে এখনও তার সাক্ষাৎ হয় নাই। সদর বাড়ী হইতেই সে তার ট্রাঙ্ক্ ও বিছানা অন্দরে পাঠাইয়া দিয়া পাড়ায় দেখা শুনা করিতে চলিয়া গিয়াছিল, তারপর ঝড়বৃষ্টি আসাতে সে ভট্টাচার্য্যের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দাবা খেলায় জমিয়া গিয়াছে।

শিবরতন অন্যদিন আহারান্তে শুইয়া পড়িতেন। যোগীন তাঁর শয়ন-কক্ষেই তামাক দিয়া আসিত, আজ কিন্তু আহারের পর শিবরতন আবার সদরে গিয়া বসিলেন এবং যোগীনকে তাঁর গড়গড়াটা শয়ন-কক্ষ হইতে বাহিরে আনিয়া দিতে বলিলেন। পর পর দু'চিলিম তামাক দেওয়া তামাক তিনি টানিয়া টানিয়া শেষ করিলেন, তথাপি বিভূতির দেখা নাই। শিবরতন আজ রাত্রেই বিভূতির সহিত দেখা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি ক্রমেই গভীর হইয়া আসিতেছিল। শিবরতনের দুই চক্ষু আজ

কয়েকদিন পরে এই প্রথম নিদ্রালু হইয়া ওঠাতে তাঁর শিথিল হস্ত হইতে গড়গড়ার নলটি বারবার খসিয়া পড়িতেছিল এবং প্রতিবারই তৎক্ষণাৎ সচকিত হইয়া জোরে জোরে উপর্য্যুপরি নলে টান দিতেছিলেন, কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ কলিকা হইতে নিঃশেষিত-প্রায় তাম্রকূটের একটু ক্ষীণ ধূমরেখাও যে নির্গত হইতেছিল না, তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

যোগীন আসিয়া ডাকিল, বাবু। রাত হয়েছে, শুতে যাবেন না?

শিবরতন জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন ছোটবাবু এলে যাবো।

যোগীন বলিল, আজ্ঞে তিনি তো কখন এসেছেন। তেনার এতক্ষণ এক ঘুম হ'য়ে গেলো!

শিবরতনের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তিনি সচকিতে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভূতি শুয়ে পড়েছে?

যোগীন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তেনাকে কি ডেকে দেবো?

শিবরতন ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, নাঃ থাক্—ঘুমিয়েছে বোধ করি।

যোগীন বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকক্ষণ!

আহা থাক্! তবে আর তাকে বিরক্ত করিস নি। ঘুমোক। কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করে তবে যেন বেড়াতে বেরোয়, তাকে বলিস,—বুঝ্‌লি! এই বলিয়া শিবরতন অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যোগীন যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

৮

বিভূতি নিদ্রা হইতে উঠিবাব অনেক আগেই শিবরতন উঠিয়া তাহাব জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাল বাত্রে বিভূতি অতি কষ্টে দাদাব সহিত দেখাসাক্ষাৎটাকে এড়াইয়া চলিয়াছে, কিন্তু আজ আব উপায নাই।

বিভূতি আসিয়া দাদাকে প্রণাম কবিবামাত্র তিনি ভাইটিকে বুকেব মধ্যে সাদবে জড়াইযা ধবিলেন, কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, তোমাদেব লেখাপড়া শেখানো আমাব সার্থক হযেছে বিভূতি। তুমি এই টাকাটা যোগাড ক'বে আনাতে শুধু যে সেবেস্তায আমাব মুখবক্ষা হয়েছে তাই নয়, তুমি আজ মৈত্র-বংশেব মান বেখেছো ভাই। যাই হোক, তোমাকে আব বেশি কি বলবো? দীর্ঘায়ু হ'য়ে সুখে থাকো। ভগবান তোমাব ভালো কববেন, কিন্তু অত টাকা তো সব আমাব নেবা'র প্রযোজন নেই ভাই, মাত্র সাতশো টাকা—যা মায়েব শ্রাদ্ধেব জন্য লেগেছিল—তাই আমি সদব কাছাবাতে জমা পাঠিযে দিয়েছি—আর এই নাও তোমাব বাকী তিনশ' টাকা। এ তোমাব কাছেই বেখে দাও।

নোটে ও নগদে পুবা তিনশ' টাকা গণিয়া শিববতন যখন বিভূতিব হাতে বুঝাইযা দিতেছিলেন—,বিভূতি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিল, এ আবাব কি। আমি আবাব কবে ওঁকে হাজাব টাকা এনে দিলুম! কিন্তু, টাকাটা যে সে আনিয়া দেয় নাই এ কথাটাও বলিতে সঙ্কোচ বোধ হইল। দাদাব দেওয়া তিনশ' টাকা হাতেব মুঠোব মধ্যে লইয়া বিভূতি বলিল, গিবিব অসুখটা কি ডাক্তার কিছু বলেছে, দাদা? মেয়েটা ত' ভুগছে আজ অনেক দিন হ'লো।

শিবরতন বলিলেন, ডাক্তার কি বলেছে না বলেছে সে ন'বউমা বলতে পারেন, আমি আমার মা-লক্ষ্মীর হাতে মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি। ওর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, বিভূতি। মা আমার যখন ভার নিয়েছেন তখন ওকে সারিয়ে তুলবেনই। আমি এই টাকাটার জন্যই ক'দিন ধ'রে খুবই চিন্তিত ও ব্যস্ত হ'য়েছিলাম, মেয়ের অসুখের কথা ভাববার সময়ই পাইনি! যাক্, তুমি এসে সে ভাবনা থেকেও আমায় রেহাই দিলে। তা' তুমি এবার কিছুদিন ছুটী নিয়ে এসেছো তো? চাকরী বজায় রাখতে গিয়ে তো দেখছি তোমার দেশে আসা এক রকম বন্ধ হ'য়ে এসেছে!

বিভূতি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, ছুটী যে বেশি দিন দিতে চায় না কি করি বলুন। শাশুড়ী ঠাকরুণ বড্ড তাড়া দিলেন ওকে নিয়ে যাবার জন্যে, তাই সোমবারটা কোনো রকমে কামাই মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। কালই এখান থেকে রওনা হ'তে হবে।

শিবরতন ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, তা' কেমন ক'রে হবে বিভূতি, ন' বউমাকে এখন নিয়ে গেলে মেয়েটা যে মারা যাবে! ওকে দেখবে কে? রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, ঘড়ি ধ'রে ঠিক টাইমে তাকে ঔষধপত্র খাওয়ানো, জ্বর দেখা, ডাক্তার এলে তাকে রিপোর্ট দেওয়া এসব কি আর কেউ পারে?—না জানে?

বিভূতি বলিল, আজ্ঞে হাঁ, সে ত বটেই। টাইফয়েডের রোগী নিয়ে নিত্য রাত জেগে বসে থাকা তো সহজ কথা নয়! ওর এসব জানা আছে বলেই পারছে। কিন্তু, শাশুড়ী ঠাকরুণ বলছিলেন—

বাধা দিয়া শিবরতন বলিলেন, তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে

বোলো যে, গিরিবালা একটু সারলেই আমি ন'বৌমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবো। এখন কিছুতেই তাঁর যাওয়া হ'তে পারে না।

এর পর যে আর কোনো কথাই বলা চলিবে না বিভূতিরতন তাহা জানিত, অগত্যা সে চুপ করিয়াই রহিল।

সোমবারের আগে রেজেষ্টারী অফিস খোলা পাওয়া যাইবে না, কারণ, বিভূতি শনিবারে বাড়ী পৌছিয়াছে অনেক দেরীতে। কাজেই সোমবারটা বিভূতিকে থাকিতেই হইবে। নচেৎ, নিতাই চক্রবর্ত্তীর লাখরাজ সম্পত্তিটা হস্তগত হওয়ায় বিলম্ব ঘটিতে পারে। চক্রবর্ত্তীদের এই বিষয়টা বিভূতি তাহার অগ্রজদের অজ্ঞাতসারে লুকাইয়া বেনামীতে খরিদ করিতেছে। কারণ, শাশুড়ী ঠাকরুণ তাহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তি খরিদ করিলে তাহা ভস্মে ঘৃত ঢালার মতই নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। তোমার বড় ভাইয়ের যেরূপ খরচের হাত তাহাতে মনে হয় না যে তোমাদের পৈতৃক জমিজমা যেটুকু আছে তাহা শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে। শাশুড়ীর কথাটা বিভূতির কাছে খুবই ঠিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। কারণ, সম্প্রতি মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহার দাদা যেরূপ অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর আশঙ্কা সত্য হইয়া উঠা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। দাদা হয় ত শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের ঋণগ্রস্তই করিয়া যাইবেন। বিভূতি তাই সময় থাকিতে সাবধান হইয়াছে। এখন হইতে স্বনামে ও বেনামে সে পৃথকভাবেই বিষয় সম্পত্তি খরিদ করিতে মনস্থ করিয়াছে। সোমবার চক্রবর্ত্তীদের বিষয়টা রেজেষ্টারী করিয়া লইবার জন্য তাহার দেশে

থাকা প্রয়োজন, কিন্তু দাদাকে ত আর সে কথা বলা চলে না, কাজেই বিভূতিরতন দাদার কাছে জয়াকে লইয়া যাইবার মিথ্যা অজুহাত দেখাইতে বাধ্য হইল।

শিবরতন বাহির হইয়া যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গেলেন, ন' বৌমার যাওয়া হবে না শুনে তুমি যেন আজই কলকাতায় রওনা হয়ো না, সোমবারটা কামাই যখন অফিস থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েই এসেছ, তখন কালকের দিনটাও এখানে থেকে যেয়ো, বুঝলে ?

বিভূতিরতন শুধু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, যে আজ্ঞে।

শিবরতন পিছন ফিরিতে না ফিরিতেই বিভূতি বাড়ীর ভিতর গিয়া জয়ার নিকট হইতে ট্রাঙ্কের চাবি চাহিয়া পাঠাইল। দাদা তাহার কাছে যে হাজার টাকা পাইয়াছেন বলিলেন এবং তাহা হইতে তিনি মাত্র সাত শত টাকা লইয়া বাকী যে তিনশত টাকা তাহাকে ফেরত দিয়া গেলেন এটা বিভূতির কাছে গোড়াতে একান্ত রহস্যাবৃত মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আশঙ্কা হইল, হয়ত' তাহার নির্ব্বোধ পত্নীটি সম্পত্তি কিনিবার জন্য লইয়া আসা টাকা হইতে দাদাকে হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়াছে।

চাবি খুলিয়া ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে নোটের তাড়াগুলি বাহির করিয়া বিভূতি এক একখানি করিয়া নোট গণিয়া গণিয়া দেখিতেছিল তাহার তিন হাজার টাকা ঠিক আছে কি না, এমন সময় চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় ত্রস্ত পদে জয়া সে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বিভূতির কাণ্ড দেখিয়া মৃদু হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, কাল ও-থেকে হাজার টাকা নিয়ে

আমি বট্‌ঠাকুরকে দিয়েছি আমার শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের দেনা শোধ ক'রতে।

বিভূতি এ সংবাদে একেবারে আগুন হইয়া উঠিল! ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া বলিল, কার হুকুমে তুমি এ টাকাতে হাত দিয়েছিলে? জানো, এ টাকা কিসের জন্য আনা হ'য়েছে?

জয়া তার স্বামীর এই বিসদৃশ ব্যবহারে কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া, কঠিন কণ্ঠে শুধু বলিল, জানি।

বিভূতি ক্রোধান্ধ হইয়া বিকৃত স্বরে বলিল, জানোতো এ টাকায় হাত দিতে গেলে কেন?

গম্ভীরভাবে জয়া বলিল, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য. এতো টাকা তোমার কাছে থাকা সত্ত্বেও তুমি মাতৃশ্রাদ্ধের ঋণ পরিশোধ করতে চাওনি বলে—

বাধা দিয়া বিভূতি ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিল, বেশ করেছিলুম! আমার খুশী। তোমার সে খোঁজে কি দরকার?—মেয়েমানুষ—মেয়ে-মানুষের মত থাকবে—বিষয়-কর্ম্মের তোমরা কি বোঝো? —নিয়ে এসো আমার টাকা ফিরিয়ে—

জয়ার চোখ মুখ অপমানের আঘাতে আরক্ত হইয়া উঠিল। তীব্র শ্লেষের সহিত সে উত্তর দিল, যাঁর সুপরামর্শে স্নেহময় বড়ো ভাইয়ের বিপদে অর্থ সাহায্য না ক'রে সম্পত্তি কেনবার দুর্বুদ্ধি তোমাকে পেয়ে বসেছে তিনিও মেয়েমানুষ এবং আমারই মা—এইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো লজ্জা!

অসহিষ্ণুর মতো বিভূতি বলিয়া উঠিল, ওসব বাজে কথা রেখে দাও! যেখান থেকে পাও আমার টাকা এনে হাজির করো এখনি!

তোমার জ্যাঠামি আমি শুনতে চাইনি—না বলে যে বাক্স থেকে টাকা বার করে নেয় সে চোর!

এই কঠিন অপমানের আঘাতে জয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর সে ধীরে ধীরে আলমারী খুলিয়া নিঃশব্দে আপনার গহনার বাক্সটি বাহির করিয়া বিভূতির সামনে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, তোমার যা টাকা চুরি গেছে—তার চতুর্গুণ তুমি এ থেকে পাবে!

৯

গিরিবালা আরোগ্য লাভ করিয়াছে কিন্তু এখনও অন্নপথ্য পায় নাই। দুরন্ত ঝড়ের অবসানে কচি ফুলের চারার মত তার শীর্ণ তনুখানিতে প্রবল রোগের আক্রমণ-চিহ্ন সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। নিষ্প্রভ চাহনির ক্লান্ত অবসন্নতা, রক্তহীন ওষ্ঠাধরের ম্লান হাসিটুকু, ক্ষীণ দুর্ব্বল হাত পা-গুলি, তৈলহীন রুক্ষ চুলের রাশি তার সর্ব্বদেহে একটি শুষ্ক ম্লান কারুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

পিঠের দিকে দুই তিনটা বালিশ উপরি-উপরি সাজাইয়া তাহাতে ঠেশ দিয়া গিরিবালা বসিয়াছিল।

শিশির ও বুড়ী তাহার বিছানার একপাশে বসিয়া 'লুডো' খেলিতেছিল। গিরিবালাও খেলার একজন ক্রীড়কের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল,—কিন্তু বারে বারে হাত নাড়িয়া খেলিবার সামর্থ্য না থাকায় তার খেলার চাল শিশির ও বুড়ীই চালিয়া দিতেছিল।

খেলা বেশ জমিয়া আসিয়াছে। গিরিবালা একান্ত মনোযোগের সহিত খেলার ঘুঁটির চাল নিরীক্ষণ করিয়া ফলাফল সম্বন্ধে আন্দাজ করিতেছিল। এমন সময়ে জয়া একটি এনামেলের বাটি হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। গিরিবালার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে, উঠে বসে খেলাও সুরু হয়ে গিয়েছে দেখচি।—দেখো, খেলার ঝোঁকে বেশিক্ষণ বসে থেকে মাথা টাথা ধরিয়ে বোসোনা যেন। এই নাও, আজ তোমার জন্যে একটু মুশুরের ঝোল তৈরী করে এনেচি; গরম গরম খেয়ে নাও।

গিরিবালা লুব্ধনেত্রে জয়ার হাতের বাটিটির দিকে তাকাইয়া উৎসুক ভাবে হাত বাড়াইল।

জয়া স্নেহ-সুগভীর নেত্রে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া সহাস্যমুখে একখানি চামচ লইয়া মুশুরের ঝোল খাওয়াইতে বসিল।

গিরিবালা ব্যস্তস্তাবে বলিল, আজ আর চাম্‌চে করে খাব না কাকিমা! নিজে বাটি হাতে নিয়ে বসে বসে খাব, হাঁ।

জয়া গিরিবালার খাওয়ার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া তৃপ্তচিত্তে বলিল, আচ্ছা, নিজের হাতে বাটি ধরে খেতে পাবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি ক'রে খেলে হবে না। আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে খেতে হবে।

ইতিমধ্যে বুড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল,—

—বকুলফুল, ও ভাই ছাখ্—শিশিরদা কি ভয়ানক জোচ্চুরি করছেন! না না—ও হ'বে না, ও দান আমরা কিছুতেই দেব না বলে দিচ্চি! পড়লো 'পাঁচ', তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বল্লেন 'ছয়'

পড়েছে! তারপর চট্‌পট্‌ আবার 'ছয়' আর 'তিন' ফেলে এখন আমার পাকা ঘুঁটীটা কাটাবার মৎলব।—

শিশির হাসিতে হাসিতে বলিল, তাই বই কি? নিজের পাকা ঘুঁটীটি কাটা পড়ছে কিনা!

বুড়ী তার সুগৌর মুখখানি বাঙা করিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে দৃঢ়তর্কে শিশিরের কথা যে সত্য নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে লড়িতে লাগিল।

শিশিরও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে অথচ নিজের জেদ্‌ বজায় রাখিয়া তাহার সহিত কথা কাটাকাটি করিতে লাগিল।

গিরিবালা মুশুরের ঝোলের আস্বাদ লইতে লইতে খেলা ও ঝগড়ার দিকে সমান আগ্রহে তাহার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি মেলিয়া রহিল।

তর্কের মাত্রা পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল, তবুও কোনও পক্ষই আপন দাবী সূচ্যগ্র মাত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে দেখিয়া গিরিবালা উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল। সে বুড়ীর দিকে তাকাইয়া চোখের ইসারা করিল এবং ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা এইবারটা না-হয় ছেড়েই দেনা ভাই বকুলফুল। যাক্‌ না তোর একটা পাকা ঘুঁটী। তোর যদি হক্কের দান হয়, এখুনিই ওটা আবার পেকে যাবে। যে জোচ্চুরি করে তার কক্ষণো জিত্‌ হয় না জানিস্‌ তো!

গিরিবালার কথা সমাপ্ত হইতে-না-হইতেই শিশির বলিয়া উঠিল, ঠিক বলেছ গিরিবালা! যে জোচ্চুরি করে তার কখনই জিত্‌ হয় না।

কথাটা বলিয়া এমন ভাবে গিরিবালা ও বুড়ীর দিকে ক্রমাগত তাকাইতে লাগিল, যেন জোচ্চুরিটা যে বুড়ীই করিয়াছে এবং হারও যে বুড়ীরই হইবে ইহাতে গিরিবালা ও শিশির উভয়েই সুনিশ্চিত।

বুড়ী আরও উত্তেজিত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল।—না, কখনোই নয়, কিছুতেই নয়। আমার পাকা ঘুঁটী মিছিমিছি জোচ্চুরি ক'রে কাট্‌তে দেব কিসের জন্য? শিশিরদা যখুনিই খেলায় হারতে আরম্ভ করেন তখুনি জোচ্চুরি সুরু করে' দেন। ঐ জন্যেই তো ওঁর সঙ্গে খেলতে চাইনে আমি।

গিরিবালার দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু দুষ্ট হাসি হাসিয়া চোখ মিটিমিটি করিয়া শিশির বলিল, দেখলে গিরিবালা, ঐ জন্যেই তো আমি মেয়েমানুষের সঙ্গে খেলতে ভালবাসি নে। বিশেষ আবার তোমার এই 'বকুলফুল'টি যখন নেহাত্‌ই পাড়াগেঁয়ে-মেয়ে!

বুড়ীর দুর্ব্বলতা ছিল কেহ তাহাকে 'মেয়েমানুষ' বলিয়া উপেক্ষা করিলে বা বিশেষ করিয়া 'পাড়াগেঁয়ে মেয়ে' বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে তাহার আত্ম-সম্মানে ও অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগিত। সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া ক্রোধোত্তেজিত হইয়া, মেয়েমানুষ যে পুরুষমানুষের অপেক্ষা কোনও গুণে নিকৃষ্ট নয় এবং পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা যে উচ্চশিক্ষিতা সহরের মেয়েদের অপেক্ষা কোনও অংশেই দীন নয় ইহাই প্রতিপন্ন করিতে পাগল হইয়া উঠিত।

আজও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। বুড়ী রাগে আগুন হইয়া উঠিল, এবং খেলার ছক্‌টি টান মারিয়া সমস্ত চলন্ত ঘুঁটীগুলি একত্রে মিলাইয়া দিয়া তর্ক করিতে বসিল।

শিশির হাঁ হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল,—আরে! আরে!! ঐ য্যাঃ! এমন জমে-ওঠা খেলাটা নষ্ট করে দিলে বুড়ু! নাঃ এ' সকল বুদ্ধিতে কিন্তু পুরুষমানুষের চেয়ে মেয়েমানুষ এবং সহুরে মেয়েদের চেয়ে পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা অনেক বেশি ওস্তাদ, আমি নিজে থেকেই স্বীকার করচি।

বুড়ী ক্ষোভে দুঃখে অপমানে আত্মহারা হইয়া কথা কহিতেই পারিতেছিল না। তাহার সমগ্র মুখখানি ও কান দু'টিতে রক্ত জমিয়া, গোধূলি আকাশের সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। টানা-টানা ভাসা-ভাসা চোখ দু'টি এতক্ষণ দীপ্তভাবে জ্বলিতেছিল, এবার জল ছলছল হইয়া উঠিল। জয়ার দিকে কাতর অভিমান ও অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বুড়ী বলিল, দেখুন না ন'বৌদি!—অতিরিক্ত দুঃখে অভিমানে রাগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, চেষ্টা করিয়াও আর কিছুই বলিতে পারিল না।

জয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া সকৌতুকে ইহাদের কলহ উপভোগ করিতেছিল। কোনও কথা কহে নাই। বুড়ীর কাতর অভিযোগে হাসিতে হাসিতে শিশিরের দিকে চাহিয়া বলিল—সত্যি শিশির! তুই বড্ড বুড়ীর পেছনে লাগিস! ছেলেমানুষ, ওকে জ্বালাতন করে কী আমোদ বাড়ে শুনি?

শিশির বুড়ীর ম্লান অশ্রু-ছলছল চোখ দু'টি ও আরক্তিম সুন্দর মুখখানির পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। জয়ার কথায় মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, আমি কি করলাম! বা রে!

জয়া হাসি চাপিতে চাপিতে কৃত্রিম কোপে ধমক দিয়া উঠিল, কেন তুই ওর সঙ্গে লাগছিস?—

গিরিবালার মুণ্ডরের সুপটুকু শেষ হইয়া গিয়াছিল। হাতের আঙুল চাটিতে চাটিতে বুড়ীর দিকে সহানুভূতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, তুই অতো রেগে যাস কেন, বকুলফুল? সেই জন্যেই তো তোকে মানুষে বেশি করে ক্ষেপায়। বেশ তো। পাড়াগাঁয়ে জন্মেছি, বড হয়েছি, পাডাগেঁয়ে হবোনা তো কি, সহুরে-ভূত হবো নাকি?

শিশির হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—এইরে—মুণ্ডর ডালে ত শরীরে বল-সঞ্চার করে শুনেছিলাম,—এ যে রসনাতেও দিব্যি বল-সঞ্চার করে দেখা যাচ্চে!—মাথাতে বোধ হয় কলহশক্তিরও সঞ্চার করে! না দিদি?—শিশির জয়ার পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

জয়া গিরিবালার পিঠের বালিশগুলি সরাইয়া সাবধানে সযত্নে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া—পথ্যের উচ্ছিষ্ট বাটিটি উঠাইয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, তোরা সারাদিন শুধু ঐ ঝগড়াই কর্ ব'সে ব'সে।

জয়াকে যাইতে দেখিয়া বুড়ীও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। গিরিবালা ব্যগ্রভাবে বলিল, ওকি! তুই এখুনিই চলে যাচ্ছিস্ নাকি বকুলফুল? এই তো এলি! আরেকটু বাদে যাসনা ভাই—

বুড়ী উদাস-গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, না—আজ যাই, দরকার আছে। ঠাকুমা একটু শীগ্‌গির করে ফিরতে বলে দিয়েছেন। যদি পারি, ও'বেলা আবার আস্‌বো 'খন।

গিরিবালা সাগ্রহে বাধা দিয়া বলিল, যদি পারি-টারি নয়, নিশ্চয়ই ওবেলা আসা চাই-ই। বুঝলে?—

শিশিরও উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই হাত মাথার উপরে খাড়া উঁচু করিয়া ধরিয়া আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে হাই তুলিয়া বলিল, তোমার বকুলফুলটিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। কি বলো গিরিবালা? পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলে তা'হলে ও'বেলা আর তোমার কাছে আসতে পারবে না তো।

বুড়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আমি একলাই বেশ যেতে পারবো। কাউকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না।

শিশির উত্তর দিল, কিন্তু ঠাকুমা যে কাল আমায় বলছিলেন আর নাকি তোমার একলা একলা রাস্তায় যাতায়াত করা, বাগানে বাগানে ঘুরে পরের গাছের ফল ফুল চুরি ক'রে বেড়ানো, পুকুরে ছিপ্ ফেলে বসে মাছধরা, গাছে দোলা টাঙিয়ে দোল্ খাওয়া—এ'সমস্ত উচিত নয়। এই সব নিষিদ্ধ কাজ করছো বলেই না ঠাকুমা শীগ্‌গির শীগ্‌গির তোমাকে—

—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি চুপ করুন তো মশাই! আপনাকে আর অত ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না কিচ্ছু। আমার যা' খুশী তাই কোরবো, আপনার তাতে কি?

গিরিবালা মৃদু-মৃদু হাসিতেছিল। সে বলিল, না ভাই বকুলফুল, উনি বরং তোকে পৌঁছে দিয়েই আসুন। একলা বাড়ী ফিরলে, ঠাকুমা হয়তো আবার ওবেলা আসতে দেবেন না।

বুড়ী গিরিবালার কথার সত্যতা মনে বুঝিয়া শিশিরের সঙ্গে যাওয়াতে আর বাধা দিল না।

পথে যাইতে যাইতে বুড়ী বলিল, বকুলফুল তো প্রায় সেরে উঠ্‌ল, এবার বোধ হয় আপনি কোলকাতায় ফিরবেন, না শিশিরদা?

শিশির বলিল, কেন? তোমাদের ধৈর্য্য কি আর টিঁকছেনা বুড়ু? এবার নিজে থেকে বিদায় না হ'লে শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় তোমরা প্রহারেণ ধনঞ্জয় ক'রে—

বুড়ী তাড়াতাড়ি জিভ্ কাটিয়া ব্যথিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, ওকি? ছিছি, চুপ করুন। কী যে আপনি বলেন শিশিরদা, তার কোনও মানেই হয় না।

শিশির বলিল, কেন? তোমরা কি আমাকে নিয়ে এই ক'দিনেই যথেষ্ট উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠোনি বুড়ু? সত্যি করে বলো।

অকৃত্রিম সরলতায় ভরা সুন্দর চোখ দু'টি শিশিরের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্থাপন করিয়া বুড়ী উত্তর দিল, একটুও না। বরং আপনার চ'লে যাওয়ার কথা মনে হলে মনটা খারাপই হয়ে যায় আমাদের!

তারপর কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া ঈষৎ বিষণ্ণস্বরে বলিতে লাগিল, তা'ছাড়া আপনি চলে গেলে আমাদের খুশী হওয়ার বা নিশ্চিন্ত হওয়ার কী আছে বলুন? আপনি তো আমাদের বাড়ীতে থাকেন না কিংবা খানও না। আমরা এত গরীব ব'লেইনা আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে পর্য্যন্ত পারিনি। ঠাকুমা রোজই তো সেজন্যে দুঃখু করেন কত!

শিশির ব্যগ্র উৎসাহে বলিয়া উঠিল, সত্যি বলচ বুড়ু? আমি কলকাতা চ'লে গেলে তোমার মনে দুঃখ হবে? সত্যি?

বুড়ী হাঁটিতে হাঁটিতে একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিতান্ত বিস্মিত মুখে শিশিরের দিকে চাহিয়া বলিল, সত্যি না তো কি, মিথ্যে বলচি

শিশিরদা? আমার কথা বিশ্বাস না করেন, ঠাকুমা বকুলফুল ওদের সব্বাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

শিশির বাঁকা হাসিয়া বলিল, ওদের আবার কী জিজ্ঞেসা করতে বলছো?

বুড়ী এবার হঠাৎ অপরিসীম লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শিশিরের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, যাঃ ন্! ভারী ইয়ে আপনি! তারপর ক্ষিপ্রচঞ্চল পদে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশির মুগ্ধনয়নে তার হরিণীসুলভ গতির দিকে স্তব্ধভাবে তাকাইয়া রহিল।

১০

কিন্তু এমন করিয়াও বেশী দিন চলিল না। পাড়াগাঁয়ে কোন কথাই শেষ পর্য্যন্ত গোপন থাকে না। বিভূতির জমি কেনার সঙ্কল্পের কথাও যথা সময়ে শিবরতনের কর্ণগোচর হইল। এমন কি, জমি কেনা পর্য্যন্ত কেন বন্ধ রহিল সে কথা শুনিয়া তাহার আর লজ্জার অবধি রহিল না।

জয়ার গায়ের গহনা বিক্রি করিয়া জমি কিনিবার শক্তি বিভূতির ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত নানা ছুতায় তাহাকে পিছাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শিবরতন বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই বাড়ীতে তাঁহার অগোচরে একটা সূঁচ কিনিবার শক্তি কাহারও ছিল না। আর আজ...

পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারিলে শিবরতন ন-বৌমার টাকাটা লইতেন কি, লইতেন না নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। হয়তো লইতেই হইত। সে দুঃসময়ে তাহা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহার দুশ্চিন্তা সেজন্য নয়। টাকার 'পরে কোনদিনই তাঁহার দরদ ছিল না। থাকিলে তাঁহার লোহার সিন্দুক আজ টাকায় ভর্ত্তি হইয়া যাইত,—জীবনে এত টাকাই তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং এখনও ওই এক হাজার টাকা ন-বৌমার হাতে ফেলিয়া দেওয়া খুব শক্ত নয়। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহার প্রতিকার কি? এ টাকাটা দিয়া দিলেও সংসারের সেই পুরাতন হাওয়া আর ফিরিয়া আসিবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। একটা চাকর আলো আনিয়া

মেঝের উপর রাখিল এবং পিছনে পিছনে গিরিবালা বাঁ-হাতে একটা আসন আর ডান হাতে কোশাকুশী এবং কাঁধের উপর একখানা মট্‌কার কাপড় লইয়া উপস্থিত হইল।

-আপনার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দোব বাবা?

শিবরতন সাড়া দিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার স্বর যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু গলাটা একবার ঘড্‌ ঘড্‌ করিয়া উঠিল।

আহ্নিক শেষ করিয়া শিবরতন ডাকিলেন,—তারা, তারা!

সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়া আহ্নিকের জায়গা পরিষ্কার করিতে করিতে গিরিবালা একবার তাঁহার মুখের পানে চাহিল। কিন্তু সেই স্বল্পালোকে তাঁহার মুখ ভালো করিয়া দেখা গেল না।

গিরিবালা জায়গা পরিষ্কার করিয়া বারান্দায় গেল, এবং তখনই একটা রেকাবীতে জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া পিতার আসনের সম্মুখে নামাইয়া দিল। শিবরতনের বুঝিতে দেরী হইল না যে, দরজার আড়ালে ন-বৌমা দাঁড়াইয়া আছেন।

জলখাবারের থালাটা কাছে টানিয়া আনিয়া শিবরতন একটু কি ভাবিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, ন-বৌমা কি চলে গেলেন, গিরি?

গিরিবালা দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, না, এই যে এখানে দাঁড়িয়ে।

শিবরতন আবার নিঃশব্দে কি যেন ভাবিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন,—

একদিন ছিল মা, যখন শম্ভুও ছোট, বিভূতিও ছোট। তখন আমি

এই সেরেস্তায় অতি সামান্য মাইনেতেই চাকরী করি। সেই মাইনেতে ওদের দুজনকে যে কি কষ্টে পড়িয়েছি, সে জানতেন মা, আর জানি আমি। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও আমি স্বপ্ন দেখতাম, ওরা একদিন বড় হবে, মানুষ হবে,—সেদিন আর কোনো ভাবনাই থাকবে না। আজকে ওরা বড়ও হয়েছে, মানুষও হয়েছে, কিন্তু—

একটু কাসিয়া শিবরতন গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন।—

ঠিক এমনি একটা সংসারের কল্পনাই করেছিলাম, মা। তোমারই মতো এমনি একটি মায়ের জন্যে আমি দিন রাত্তির সাধনা করেছি। মা ছাড়া আমার একটি দিনও চলে না। তাই মা যেদিন স্বর্গে গেলেন সেদিন কষ্ট আমার যতই হোক, ভাবনা হয়নি এতটুকু।

গিরিবালা তাড়াতাড়ি বলিল, ন খুড়ীমা কাঁদছে, বাবা।

সে কথায় কান না দিয়া শিবরতন আপন মনেই হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু ভেবে ভেবেই যার এতগুলো দিন গেল, তার বাকী দিনগুলোর ভাবনা বুঝি বিধাতাপুরুষও ঘোচাতে পারেন না। না পারুন, দুশ্চিন্তা আমার সয়ে গেছে। কেবল আমার সংসারে আমার নিজের কাছেই কেমন যেন দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছি মা। কারো ওপর যেন ভরসা করতে পারছি নে,—কারো ওপর যেন জোর খুঁজে পাচ্ছিনে। সেইটেই হয়েছে অসহ্য।

শিবরতন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন।

বলিলেন, সুখ যে একেবারে পাই নি তাও নয়। কিন্তু সে আমার সইলো না মা। এই ক'দিন আমি কেবলি ভেবেছি, কেবলি ভেবেছি। আজ নিশ্চিন্ত ক'রে স্থির করেছি, পৃথক হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তারপরে ক'দিন বাঁচবো জানিনে তবু পৃথক হতেই হবে। সে কথা কাল বিভূতিকে লিখে দিচ্ছি।

শিবব্রতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জলখাবার স্পর্শ করিতেও ভুলিয়া গেলেন।

অকস্মাৎ গিরিবালা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, বাবা, ন-খুড়ীমা কেমন করছে।

এবং তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই জয়া সশব্দে পড়িয়া গেল। সে শব্দ শিবব্রতন শুনিতে পাইলেন। তিনি শূন্য গড়গড়াটা অকারণে টানিতে টানিতে বলিলেন, বোধ হয় ফিট্, গিরি, কাউকে ডেকে দে।

কিন্তু সে স্বর তাঁহার নিজের কান পর্য্যন্তই পৌঁছিল কি না সন্দেহ।

শনিবার আসিতে কয়েকদিন দেরী ছিল। বিভূতির আসিবার কথা শনিবারে। এই কয়দিন শিবব্রতন আর বাড়ীর দিকে যান নাই। এবং জয়া ফিট্ হইতে উঠিয়া সেই যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, আর ওঠে নাই।

শম্ভুব্রতন বাড়ী হইতেই কোর্টে যাওয়া-আসা করে। দাদার মুখের ভাব দেখিয়া সে-ও আড়ালে আড়ালেই ফিরিতেছে। পৃথক হওয়ার সঙ্কল্পের কথা দাদার মুখে শুনিয়া অবধি সে যেন অকূলে ভাসিতেছে। সংসারের কিছুই সে জানে না,—কোনোদিন জানিবার চেষ্টাও করে নাই। যাহা কিছু রোজগার করে মাসের শেষে দাদার হাতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

দাদার মুখের উপর ইহার প্রতিবাদ করিবার সাহস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কয়দিন কথাটা সে নিজের মনে মনেই নাড়াচাড়া করিল। অবশেষে একদিন বড় বৌ এর কাছে কাঁদিয়া পড়িল।—

—এমন অনাসৃষ্টি কল্পনা তিনি কেন করলেন তাও জানিনে বৌদি। বিভূতি যদি কোন দোষ করেই থাকে, তার শাস্তি কি আমাকে নিতে হবে? আমি সংসারের কি জানি বলো তো?

বড় বৌ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না। তবে কিছু যে একটা হইয়াছে, ছোট বৌ-এর অসুখ যে দেহে নয় এমন অনুমান সে মনে মনেই করিতেছিল। কিন্তু তাহার মূলে যে এত বড় একটা কারণ থাকিতে পারে, ইহাদের ভায়ে-ভায়ে যে কোনদিন পৃথক হইতে পারে এমন কথা সে কোনোদিন কল্পনাও করে নাই।

প্রথমটা সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপরে টিয়াপাখীর মত ঘাড় কাৎ করিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে শম্ভুর মুখের প্রত্যেকটি কথা আর একবার ভালো করিয়া শুনিয়া লইল। মনে মনে সে যেন খুশীই হইল।

শম্ভু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি ছাড়া এ বিপদে আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, বৌদি। তুমি একটু চেষ্টা কর।

বড় বৌ অন্যমনস্কের মত বলিল, দেখি তো।

বাহিরে আসিতেই শম্ভু দেখিল দরজার পাশেই মেজ-বৌ দাঁড়াইয়া। শম্ভু অন্যদিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, মেজ বৌ ডাকিল, শোনো।

শম্ভু ফিরিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে গেল।

মেজবৌ-এর মুখ-চোখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল, আমাকে পাঁচটা টাকা দেবে ?

মেজবৌ কোনদিন তাহার কাছে টাকা চায় নাই। এ বাড়ীতে স্বামীর কাছে টাকা চাওয়ারও নিয়ম নাই, স্বামীর নিজে হাতে টাকা দেওয়ারও নিয়ম নাই। এ বাড়ীর বৌ-রা প্রয়োজনের জিনিষ আগে শাশুড়ীর কাছ হইতে পাইত, এখন বড়বৌ-এর মারফৎ পায়।

শম্ভু বিস্মিতভাবে বলিল, টাকা !

হাসিতে মেজবৌ-এর সমস্ত দেহ হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ, টাকাই ! ঠাকুরের ভোগ দিতে হবে যে।

শম্ভুর বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল, তার মানে ?

মেজবৌ তাহার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে মাথা দুলাইয়া বলিল. আমি শুনেছি গো, তোমাদের সব কথাই শুনেছি। আর লুকোতে হবে না।

শম্ভু বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল, ছাই শুনেছ ! দাদা শুধু বিভূতিকেই পৃথক ক'রে দিচ্ছেন না,—আমাকেও।

হাত জোড় করিয়া মেজবৌ বলিল, আজ্ঞে, তাও শুনেছি।

শম্ভু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, মেয়েমানুষ ; ভাবছ ভারী মজাই হবে। কিন্তু মজা যে কি সে আমি জানি। ন'টার সময় বেরিয়ে যাই, ফিরতে সন্ধ্যে সাতটা। ক্ষুদ-কুঁড়ো বাও বা আমাদের আছে, সে যে কোথায় আছে কিছুই জানিনে। আমার সম্পত্তি কে দেখা-শুনো করবে শুনি ?

মেজবৌ চটিয়া বলিল, ন্যাকা! পৃথিবী শুদ্ধ লোকের বিষয়-সম্পত্তি দাদাই দেখাশুনো করে কিনা? ভায়ে-ভায়ে কেউ তো কখনো পৃথক হয় নি।

অন্য সময় হইলে শম্ভু এ কথায় চটিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইত। আশ্চর্যের বিষয় আজ একটি কথাও বলিল না। শুধু মেজবৌ এর পানে একটুক্ষণ রূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল।

ভালো কথা বলিতে আসিয়া এমন উপেক্ষা মেজবৌ অনেক সহিয়াছে। আপন মনেই সে ঘরের মধ্যে বিড়্‌বিড়্‌ করিতে লাগিল।

রাত্রে আহারাদির পর শিবরতন বাহিরের ঘরে নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। গড়গড়ার নলটি তখনও হাতে ধরাই ছিল, মুদ্রিত চোখে একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। এমন সময় বড় বৌ আস্তে আস্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ঘুমুলে না কি?

শিবরতনের ঘুম তখনও আসে নাই। কিন্তু সাড়া দিতে সাহস করিলেন না।

বড় বৌ শিয়রের কাছে বসিয়া শিবরতনের ললাট স্পর্শ করিল। উত্তাপ ছিল না। বড় বৌ ললাটের চুলগুলি সযত্নে দু'পাশে সরাইয়া দিয়া বলিল, আমাকে আর দুঃখ দিও না। ওঠো, ভিতরের ঘরে শোবে চল।

বহুকাল আগে শিবরতনের একবার অসুখ করিয়াছিল,—কঠিন অসুখই। তখন দু'জনেরই বয়স অল্প। তখন এ বাড়ীতে দিনের বেলায় স্বামী-সন্দর্শনের প্রথা ছিল না। শিবরতন সমস্ত দিন রোগ-শয্যায় শুইয়া শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেন। সহস্র কাজের মধ্যে বড় বৌ-এর কানে তাহা পৌঁছিত। তবু একবার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিন্তু রাত্রে এমনি সস্নেহে সমস্ত রাত্রি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিত। ঘুমাইতে বলিলেও কিছুতে ঘুমাইত না।

সেই বহুকালের বিস্মৃত কথা শিবরতনের আবার মনে পড়িয়া গেল! সস্নেহ করস্পর্শে তাহার মনে হইল, এমন শান্তি তিনি বহুকাল বোধ করেন নাই।

শিবরতন আস্তে আস্তে চোখ মেলিয়া চাহিলেন, এবং ছেলেবেলার মত তেমনি করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হ'ল বড় বৌ, শুতে যাও।

বড় বৌ উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। বলিল, ঘুম কি আমার চোখে রেখেছ? নিজের চেহারার পানে একবার তাকিয়ে দেখ তো, কি চেহারা হয়েছে।

বড় বৌ-এর গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। বলিল, কিন্তু এমন ক'রে আমায় দগ্ধে' মারার দরকার কি? একেবারেই মেরে ফেল না?

বড় বৌ আঁচলে চোখ মুছিল।

শিবরতন কোনো কথাই কহিতে পারিলেন না। শুধু তাহার একখানি হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বড় বৌ বলিতে লাগিল, সারাদিন পাঁচ ভূতের ব্যাগার খাটা,—

একবার তোমার পানে চেয়ে দেখবার অবসর পাইনে। কেন এত খাট্‌বো? কিসের জন্যে? আমার ওই একমাত্র মেয়ে, আমি আসছে মাসেই তার বিয়ে দিয়ে কাশী চলে যাব।

শিবব্রতন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বড় বৌ-এর একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, যাবে বড় বৌ, কাশী? সত্যি আমি আর পারছি নে।

—যাবোই তো। কিন্তু ওদের লাঞ্ছনাও দেখে যাব। যেদিন থেকে শুনেছে পৃথক হব, সেদিন থেকে তোমার ন'বৌমা শয্যা নিয়েছেন,—কুটোটি ভেঙে দু'খানা করছেন না। মেজ বৌ বেড়াচ্ছেন আড়ালে আড়ালে। কিছু কি বুঝি না?

শিবব্রতনের কাশীবাসের উৎসাহ চলিয়া গেল। তিনি আবার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নলটা একবার মুখে দিলেন, কিন্তু বোধ না পাইয়া তাহাও নামাইয়া রাখিলেন।

বড় বৌ চোখ ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিল, আবার নেজবাবু এসেছিলেন কাঁদুনী গাইতে। কচি খোকা, কিছু তো জানেন না। ছোট্‌ঠাকুরপোকে আসতে লিখে দিয়েছ তো? বাবা! পেটে-পেটে কত বুদ্ধিই খেলেন!

শিবব্রতন আর পারিলেন না। অত্যন্ত ক্লান্তস্বরে বলিলেন, শরীরটা বড়ই খারাপ করছে, বড় বৌ। তুমি বরং আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও।

বড় বৌ কিন্তু অত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না। আরও অনেকক্ষণ বকিয়া-বকিয়া যখন দেখিল শিবব্রতন সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

১১

শনিবারে বিভূতি আসিয়া যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন রাত্রি এগারোটা। ষ্টেশনে তাঁহাকে আনিবার জন্য যথারীতি একজন চাকর গিয়াছিল। অত রাত্রে পাড়াগাঁয়ে খুব কম লোকই জাগিয়া থাকে। বিভূতির সুবিধা হইল এই যে, পথে কাহারও সঙ্গে দেখা হইল না। তাহার মনে হইল, এই পৃথক হওয়ার ব্যাপার লইয়া গ্রামে রীতিমত ঘোঁট চলিতেছে। কল্পনায় সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মধু ভট্‌চায্‌ কুটিল হাসিয়া তর্জ্জনী নাড়িয়া বলিতেছে, আর দু'বার তারপরে—

পৃথক হওয়ার কুফল নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু,—বিভূতির শাশুড়ী বলিয়া দিয়াছেন,—ব্যক্তিগতভাবে বিভূতির ইহাতে ভালোই হইবে। পাড়াগাঁয়ে চিরদিন বাস করা তাহার পক্ষে পোষাইবে না। তাহার উপর শিবরতনের খরচের হাতটা অত্যন্ত বেশী। এমন করিলে সংসার টিকিবে কি করিয়া!

বাহিরের বৈঠকখানায় মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা আলো জ্বলিতেছিল। বিভূতির আশঙ্কা হইল, শিবরতন হয়তো ওঘরে শুইয়া আছেন। সে অতি সন্তর্পণে পাশ কাটাইয়া সদর দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিন্তু বিপদ তো বিভূতির একটা নয়। আগেরবার টাকা লইয়া জয়ার সঙ্গে একটা লজ্জাকর কলহ হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে যে কিরূপ সম্বর্দ্ধনা পাওয়া যাইবে তাহা অনিশ্চিত। মৃদু কাশিয়া বিভূতি তাহার শয়ন কক্ষের দ্বার ঠেলিল।

সুমুখেই খাবার ঢাকা ছিল। তাহারই পাশে মেজেয় বসিয়া জয়া

একখানি বই পড়িতেছিল। সে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হাসি দেখিয়া বিভূতি অনেকটা ভরসা পাইল। চাদরটা আল্‌নার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বিভূতি ধপ্‌ করিয়া খাটের উপর বসিয়া বলিল, উঃ! কি গরম!

জয়া বিভূতির পাঞ্জাবীর বোতামগুলি খুলিয়া দিয়া পাখা করিতে বসিল।

জিজ্ঞাসা করিল, ওখানকার খবর ভালো?

বিভূতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভালোই।

—তুমি রাত্রের গাড়ীতে এলে যে! সবাই ভেবেছেন, তুমি আজ আর এলে না! এ গাড়ীটায় তুমি তো বড় আস না।

বিভূতি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহ'লে যোগীনকে ষ্টেশনে পাঠালে কে?

জয়া মাথা নীচু করিয়া বাতাস করিতে লাগিল, উত্তর দিল না।

বিভূতি তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পাঠিয়েছ?

এবারে জয়া হাসিয়া বলিল, আমার কেমন মনে হ'ল তুমি নিশ্চয় আসবে। বাড়ীর কেউ জানেই না যে, যোগীন গেছে।

সমস্ত রাত্রি দু'জনে অনেক কথাই হইল। বিভূতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহার গতবারের দুর্ব্ব্যবহারের উল্লেখ মাত্র জয়া করিল না,—না করিল পৃথক হওয়ার প্রসঙ্গের অবতারণা। সকালে

বিভূতিব যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বিভূতিব মন একেবাবে হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সে বেশীক্ষণেব জন্য নয়।

তখনও বিভূতিব চা খাওয়া হয় নাই, এমন সময় যোগীন আসিয়া সংবাদ দিল, বড বাবু ডাকিতেছেন।

বিভূতি বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিল, শিববতন ঘবেব মাঝখানে বসিয়া একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়া মুদ্রিতনেত্রে নির্ব্বিকারভাবে তাম্রকূট সেবন কবিতেছেন। শম্ভু এক কোণে দুই হাঁটুব মধ্যে মাথা গুজিয়া ঘুমাইতেছিল, কি জাগিয়াই ছিল বোঝা গেল না। আব পাডাব কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একগাদা কাগজপত্র লইয়া তুমুল বিতর্ক আবম্ভ কবিয়া দিয়াছেন।

বিভূতিকে কেহ বসিতে বলিল না। শিববতন একবাব শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া আবাব চোখ বন্ধ কবিলেন। শুধু পাডার ভদলোকেবা তাহারই গৃহে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া বলিলেন, এই যে বিভূতিবাবু, বোসো, বোসো। কলকাতাব খবব ভালো?

তাও অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে। বলবাম সান্যালেব স্বদেশী সংবাদে কৌতূহল বড বেশী। বিভূতি আসিলেই তাহাকে ধরিয়া বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবেন। কিন্তু শিববতন ও শম্ভুবতনেব করুণ-বিষাদ

মুখভাবে ঘরের হাওয়া এমনই বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বলরাম সে কৌতূহল দমন করিয়া ফেলিলেন।

ভদ্রলোকেরা প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করিতেছিলেন। কিন্তু কাহারও কোনো সাড়া না পাইয়া শেষটা নিজেরা যাহা ভালো বুঝিলেন তেমনি একটা ব্যবস্থা করিয়া তিন ভাইকে পড়িয়া শুনাইয়া দিলেন।

অবশেষে তিনখান বণ্টননামা তৈরী হইল। বলরাম তিন ভায়ের কাছে তিনখানা বণ্টননামা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, কথায় বলে 'ভাই-ভাই, ঠাই-ঠাই'। দুঃখু করা মিথ্যে বাবাজি, ভায়ে-ভায়ে পৃথক একদিন হ'তেই হয়। না কি বল রাখাল?

রাখাল ইহাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ,—বিভূতির বন্ধু। সে কথা কহিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

বনমালী গোসাঁই কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিলেন, এই যে আমাদের—

গোসাঁই বাড়ীর কথাটা সবাই জানিত। হাতের কাছে এত বড় একটা দৃষ্টান্ত পাইয়া সকলে সমস্বরে বলিল, হ্যাঁ, এই তো এঁদের—

এক কথায় এত বড় সমস্যার সমাধান করিয়া গোসাঁই হাঁকিলেন, কোথায় রে যোগীন তামাক দিয়ে যা।

শিবরতন বণ্টননামাটা পড়িয়াও দেখিলেন না, নিঃশব্দে সই করিয়া দিলেন,—দেখা-দেখি আর দুই ভাইও।

১২

সেদিন আর রান্নার হাঙ্গামা ছিল না। সান্যালদের বাড়ী শিবরতন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার, বাগচীদের বড় বাড়ীতে শম্ভু, তার স্ত্রী ও ছেলে-গুলির এবং বাগচীদের ছোট বাড়ীতে সস্ত্রীক বিভূতির নিমন্ত্রণ ছিল।

এতদিন ধরিয়া সমস্ত সংসারের রান্নার ভার বড় বৌয়ের উপরই ছিল। সকালে উঠিয়া স্নান সারিয়া সে রান্নাঘরে ঢোকে, বেলা দু'টার আগে আর বাহির হইতে পায় না। কিন্তু সেদিন আর তাহার রাঁধিবার আগ্রহ দেখা গেল না। তরকারী কোটা, বাট্‌না বাটা, রান্নার জল তোলা প্রভৃতি কাজের ভার মেজ বৌয়ের উপর। কিন্তু থামের গোড়ায় বড় বৌকে নিস্পৃহভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সেও আর আগাইল না, কচি ছেলেটাকে কোলে করিয়া দুধ খাওয়াইতে বসিল।

বাগচীদের বড় গিন্নি সংসারে অনেক দেখিয়া চুল পাকাইয়া-ছেন। শম্ভুর স্ত্রী তাঁহার মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি-রকম ভাইঝি হয়। কথাটা তিনি রাত্রিতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, সকাল হইতে না হইতেই তিনি শম্ভুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করার জন্য এমনই চীৎকার করিয়া বার'বার মেয়েকে তাগিদ দিতে লাগিলেন যে, কথাটা ছোট বাড়ীর রাখালেরও কানে গেল। রাখাল তখন রোয়াকে বসিয়া দাঁতন করিতেছিল। তাড়াতাড়ি মাকে বলিল, ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে ও-বাড়ীর জ্যেঠিমা। আজ যে ওরা পৃথক হবে মা,—বিভূতিদের খাওয়ার ব্যবস্থা এইখানেই কর।

রাখালের মায়ের মন ভালো। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন এবং সাণ্ডেল গিন্নীকে ফিবিবাব পথে সে কথাটা শুনাইয়াও আসিলেন। সুতরাং সাণ্ডেল গিন্নীও নাতিনীকে পাঠাইলেন গিরিবালাদের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য।

বুড়ী পরমোল্লাসে নিমন্ত্রণ কবিতে আসিয়া দেখিল, গিরিবালাদের বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা খুব সামান্যই, কিন্তু কলহ হইল তুমুল,—এবং যাহাদের মধ্যে কোনোদিন কলহ হয় নাই, তাহাদেরই মধ্যে।

শম্ভুর স্ত্রীব দোষ নাই। বেচারী একধারে কচি ছেলেটাকে দুধ খাওয়াইতে ছিল। তাহাব দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বড বৌ হঠাৎ বলিয়া বসিল, দুধ খাওয়া কাল থেকে বেরুবে। গোরু তো আমি রাখবো না,—সব বিক্রি ক'বে দেব।

মেজ বৌ প্রথমে কথাটা শুনিয়াও শুনিল না। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে মাবা যাওয়াব পর বড বৌয়ের ওই গিবিবালাই সম্বল। তারপরে আর তাহার সন্তান হয় নাই। সুতরাং বাড়ীতে ছেলে বলিতে শম্ভুর ওই দু'টিই। বড বৌ তাহাদের আদব করিয়া নাম দিয়াছে রাম-লক্ষ্মণ। উহাদের উপর বড বৌয়েব স্নেহ মেজ বৌয়েব অবিদিত নয়। অনেকটা সেইজন্যও সে প্রথমটা চুপ করিয়া গেল। কিন্তু বড় বৌ এই সম্বন্ধে আর দু-একটি কথা বলিতেই সে-ও আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। টুক্ করিয়া উত্তর দিল, গোরু বিক্রিই যদি কর বড়দি, আমাকেই কোরো, আমিই কিনবো।

একটুখানি কথা, কিন্তু ইহার মধ্যে ঝাঁঝ ছিল প্রচুর। সে ঝাঁঝ

বড় বৌ সহ্য করিতে পারিল না, রসনার বল্গা ছাড়িয়া গেল। সে চীৎকার শুনিয়া ন-বৌ একবার দরজার বাহিরে উঁকি দিয়াই তখনই সরিয়া পড়িল। তাহার মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সে ক্লান্তভাবে শয্যা গ্রহণ করিল।

তুমুল ঝগড়া!

এমন সময় বৈঠকখানা হইতে তিন ভাই অন্দরে প্রবেশ করিল। শিবরতন দরজার গোড়াতেই থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মেজবৌ ছেলে কোলে করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। শিবরতনের পাশে দাঁড়াইয়া শম্ভু এমনভাবে কট্ মট্ করিয়া সেদিকে চাহিল যে, মনে হইল, শিবরতনের আজ্ঞা পাইলে সে এখনই গিয়া মেজ বৌয়ের টুঁটি চাপিয়া ধরে। কিন্তু শিবরতন সেরূপ কোনো আদেশই দিলেন না। যেমন নিঃশব্দে তিনি আসিয়াছিলেন তেমনি নিঃশব্দে বহির্ব্বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মৃদু দীর্ঘশ্বাস কাহারও কাণে পৌঁছিল না। শম্ভু কপালে হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। আর বিভূতি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বিভূতিকে দেখিয়াই জয়া ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু হাসি দিয়াও সে চোখের মুখের ক্লান্তি ঢাকিতে পারিল না।

বিভূতি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি শরীর খারাপ করছে।

—শরীর খারাপ করবে কেন ?

—তবে, এত বেলা অবধি শুয়ে ছিলে যে ?

এ প্রশ্নের আর জয়া উত্তর দিল না। বাক্স হইতে তেল বাহির করিয়া বিভূতির মাথায় মাখাইতে বসিল।

একটু পরে বলিল, আজ দুপুরে রাখাল ঠাকুরপোর বাড়ী তোমার নেমন্তন্ন।

—রাখালের বাড়ী ? হঠাৎ ?

এ প্রশ্নেরও জয়া উত্তর দিল না। বলিল, মাথার চুলগুলো কেটে ফেল, এত ফ্যাশান ভালো নয়।

বিভূতি হাসিয়া বলিল, যে আজ্ঞে।

—দেখি, পা-দুটো দেখি। বাঃ-বাঃ পা দিয়ে যে খড়ি উঠছে। তুমি কি পায়ে তেল মাখো না ?

বিভূতি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। তারপর কিছুক্ষণ সস্মিত-দৃষ্টিতে জয়ার পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, আর একদিন তুমি এমনি ক'রে তেল মাখিয়ে দিয়েছিলে জয়া,—ঘর-বসতের পরেই। মনে পড়ে ?

জয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তুমি সে-কথা এখনো ভোলনি।

ভুলি নি। কোনোদিনই বোধ করি ভুলতে পারব না।—বিভূতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল,—সেদিন এই নিয়ে ঘরে-পরে যে লাঞ্ছনা তুমি ভোগ ক'রেছিলে সে আমি কোনোদিন ভুলবো না।

শুধু কি তুমি ? আমিও লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি নি। অথচ স্বামিসেবা এমনই বা কি অপরাধ ? আমাদের বাড়ীতে এসে অনেক লাঞ্ছনাই তুমি সইলে।

– বেশ ক'রেছি। তুমি থামো তো।

কিন্তু বিভূতি থামিল না। বলিল, আচ্ছা, আজকে তোমার ভয় করল না ?

না। ভয় কেন করবে ?

-সবাই যদি আবার তেমনি ক'রে নিন্দে করে ?

জয়া রাগিয়া বলিল, করুক গে। তাতে তো আর গায়ে ফোস্কা পড়বে না ?

কথাটা বলিয়াই জয়ার মনে পড়িয়া গেল, আরও একটা ভালো উত্তর আছে। সে বিভূতির আরও কাছে ঘেঁসিয়া ঠোঁটে একটু মধুর হাসি টানিয়া বলিল, আর নিন্দেই বা করবে কেন শুনি ? আমি কি কারো ধার ধারি ?

বলিয়া সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিভূতির মুখের পানে চাহিল। কিন্তু বিভূতি খুশী হইল, কি বিস্মিত হইল ঠিক বুঝিতে পারিল না।

বিভূতি টিপিয়া-টিপিয়া হাসিয়া বলিল, ধারো না। কিন্তু যদি বড়দাই নিন্দে করেন ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে জয়ার দেরী হইতে লাগিল। কি বলিবে প্রথমটা ভাবিয়া পাইল না। তারপরে বলিল, তিনি কি কখনো কারো নিন্দে করেছেন, যে আজ আমার নিন্দে করবেন ?

বিভূতিও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল, যদিই করেন ?

—আমি জানি, তিনি তা করবেন না। তুমি ওঠো তো। খুব তেল মাখা হয়েছে। এইবার স্নান ক'রে এস।

বলিয়া আল্‌না হইতে গামছাটা পাড়িয়া আনিয়া বিভূতির হাতে দিল।

বিভূতি গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আজ আর তাহাদের বাড়ীতে রান্না হইবে না, রাখালের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, এ কথাটা সে কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিল না।

দোর গোড়াতেই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমাকে তো খুব তাড়া লাগাচ্ছ। তোমাকেও তৈরী হতে হবে না?

—আমি আবার কিসের জন্যে তৈরী হব? আমার তো নিমন্ত্রণ নেই, শুধু তোমার।

—বেশ! আর তুমি খাবে কোথায়?

—আমি খাব না।

—তা তুমি পারো।

তারপরেই গলা নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর গিরিবালারা কোথায় খাবে জানো? মেজদারা?

—আমি কি ক'রে জান্‌বো?

অন্যমনস্কভাবে বিভূতি বলিল, একবার জিগ্যেস করলেও তো পারতে।

—তুমি জিগ্যেস করো না।

হুঁ।—বলিয়া চিন্তিতভাবে বিভূতি চলিয়া গেল। কিন্তু কথাটা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

১৩

বিকালের রৌদ্র তখন পড়িয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। বিভূতি কোথায় বাহিরে গিয়াছিল। জয়া অত্যন্ত অলসভাবে বিছানায় শুইয়া ছিল। পিছনের বাগানে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে কাণামাছি খেলিতেছিল। শুইয়া শুইয়াই জয়া তাহাদের আনন্দ-উল্লাস শুনিতে পাইতেছিল।

এক সময় গিরিবালার চীৎকার কাণে আসিতেই জয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। তাড়াতাড়ি জানালার কাছে উঠিয়া গিয়া গিরিবালাকে ডাকিল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক শুনিয়া গিরিবালা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি বলছো ?

জয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, কি বলছো ? বুড়ো-ধাড়ী মেয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা হচ্ছে, লজ্জা করে না ?

আহত অভিমানে গিরিবালা বলিল, আমি আবার লাফিয়ে লাফিয়ে খেললাম কখন ? আমি তো বুড়ী হয়েছিলাম।

—বেশ করেছিলে ! এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এল, বট্‌ঠাকুরের আহ্নিকের জায়গা করতে হবে না ?

কথাটা গিরিবালার মনে ছিল না। ছোট মেয়ে, খেলার উত্তেজনায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

গিরিবালা তাড়াতাড়ি অপ্রতিভ ভাবে বলিল, এখনো তো সন্ধ্যে হয় নি।

বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। জয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আর শোন্।

—কি ?

কথাটা কি ভাবে পাড়িবে ভাবিবার জন্য জয়া একটু সময় লইল।

তারপর বলিল, বড়দি কি জলখাবার তৈরী করছেন ? না করলে খবর দিবি, আমি বরং ষ্টোভেই দু'খানা লুচি ভেজে দোব। বুঝলি ?

গিরিবালা ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া গিন্নির মতো ভারিক্কি চালে বলিল, মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না, খুড়ীমা। কোথায় যে গেলেন জানি না। তুমি বরং দু'খানা লুচি ভাজো, আমি আহ্নিকের জায়গা করতে চললাম।

লুচি ভাজিয়া একখানি রেকাবীতে সাজাইয়া জয়া বাহিরের ঘরে দিয়া আসিবার জন্য বাহির হইতেই দেখিল, বড় বৌ হন্তদন্ত হইয়া আসিতেছে।

বড বৌকে দেখিয়াই জয়া অপ্রস্তুতভাবে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, সন্ধ্যে হয়ে গেছে দেখে আমিই দু'খানা লুচি ভেজে দিলাম, বডদি।

বড় বৌ এই জন্যই তাড়াতাড়ি আসিতেছিল। জয়ার কথা শুনিয়া খুশী হইয়া গেল। বলিল, আ আমার কপাল ! আমি ত ওই জন্যেই ছুটতে ছুটতে আসছি।

তারপর গলা খাটো করিয়া বলিল,—কোনো দিন কি করেছি

বোন, যে মনে থাক্‌বে ? চিরদিন তোরা দুজনেই যা হয় করেছিস্। আজ যে আমরা পৃথক হয়েছি সে কথা মনেই ছিল না।

বলিতে বলিতে বড় বৌ-এর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

কিন্তু জয়ার তখন আর দাঁড়াইবার সময় নাই। বলিল, তাহ'লে জল খাবারটা দিয়ে আসুন, দিদি।

—না, না, না। ও তুই-ই দিয়ে আয় ভাই। আমি বরং কিন্তু

বড় বৌ থামিল। তারপরে জয়ার একখানি হাত টানিয়া লইয়া বলিল, আশ্চর্য্য দেখ বোন্, আজ থেকে রাম লক্ষ্মণ তো আর আমার কেউ নয়। আজ থেকে হয়তো তারা রাত্রে আমার ঘরে শুতেও আসবে না। অথচ তাদেরই জন্যে ভাবনার আমার অন্ত নেই। আর যে আসল লোক তার কথা মনেই পড়লো না।

শিবব্রতনের হয়তো আহ্নিক হইয়া গিয়াছে। জয়া আর দাঁড়াইতে পারিল না। বৈঠকখানার দ্বারের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

তাঁহার আহ্নিক শেষ হইতে বেশী দেরী হইল না। গিরিবালা আহ্নিকের জায়গা মুছিয়া লইল। এবং বাহিরের খুড়ীমার হাত হইতে খাবার লইয়া গিয়া দিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শিবব্রতন কোনো কথা কহিলেন না। তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, এ সব কথা বলতে খুব কষ্ট হয় মা, কিন্তু কষ্ট ক'রে আমার খাবার তৈরী করার দরকার নেই। বড় বৌ-এর কাজ তো এখন অনেক কমলো। খাবার তৈরী করতে তা'র তো আর অসুবিধে হবার কথা নয়।

গিরিবালা একবার উঁকি দিয়া দেখিল, জয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া আছে। শিবরতন পাছে আরও কিছু কঠিন কথা বলিয়া বসেন এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, খুড়ীমাকে আজকে কিছু বোলো না, বাবা। সমস্ত দিন শুধু একটু দুধ খেয়ে আছে।

এক মুহূর্ত্তে শিবরতন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কেন, কেন? শরীর খারাপ নাকি? এখানে আবার ভয়ানক ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে। গায়ে-হাতে ব্যথা করছে নাকি?

গিন্নিবালা শরীরের অসুখের কথাই শুনিয়াছিল।

বলিল, তা জানি না। বলছে শরীর খারাপ।

জয়া আর থাকিতে পারিল না। যাচিয়া প্রশংসা কুড়াইবার অভ্যাস তাহার কোন কালেই ছিল না। কিন্তু ভাসুরের মুখে একটি প্রশংসার বাণী শুনিবার জন্য তাহার লোভ অপরিসীম হইয়া উঠিল।

ইঙ্গিতে গিরিবালাকে ডাকিয়া বলিল, বল্, মৈত্র বাড়ীর গিন্নি কি কোনো দিন কারও বাড়ীতে পাত পেড়েছে যে, আজকে যাবে?

গিরিবালাকে বলিতে হইল না। আবেগের আতিশয্যে জয়া এমন ভাবেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহা সরাসরিই শিবরতনের কানে পৌঁছিল।

একথা শিবরতনের নিজেরও স্মরণ ছিল না। মৈত্র বাড়ীর গৃহিণী কোনো দিনই কোনো বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। বধূরা যাইত বটে, কিন্তু তাহারা পৃথক ভাবে অন্য কক্ষে আহার সমাপন করিয়া চলিয়া আসিত। এ গ্রামে এইরূপই প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল,

এবং এজন্য কাহারও কোনো ক্ষোভ ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে এই বংশে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপরে কতকাল চলিয়া গিয়াছে। সে পণ্ডিত আর নাই, বিদ্যার সে অভিজাত্যও এ বংশের আর কেহ অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু পূর্ব্বের সেই প্রথা এখনও চলিয়া আসিতেছে।

শিবরতন প্রথমটা বিস্ময়ে আনন্দে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। অবশেষে ভারী গলায় বলিলেন, তোমাকে নতুন ক'রে আশীর্ব্বাদ করবার কোনো কথাই তো রাখিনি মা। তবু আশীর্ব্বাদ করি, এই মর্য্যাদাবোধ যেন কোনো কারণেই তুমি না হারাও।

শিবরতন আর বলিতে পারিলেন না। নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, তাহ'লে আজ রাত্রে তুমি কি খাবে?

উত্তরটা জানাইবার জন্য গিরিবালা বাহিরে মুখ বাড়াইল। কিন্তু জয়া তখন চলিয়া গিয়াছে।

১৪

জমি, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সকল কিছুর বিভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তথাপি একটা গোলযোগের আর মীমাংসা হইল না।

এতদিন পর্য্যন্ত এই সংসারের রান্না-বাড়ার ভার ছিল বড় বৌ-এর। সেই সঙ্গে দেবর-পুত্র রাম-লক্ষ্মণকে তেল মাখানো, স্নান করানো এবং খাওয়ানোর ভারটাও কি করিয়া তাহারই উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই কাজটা হাতছাড়া হওয়ায় তাহার কিরূপ অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ওদিকেও মেজ বৌ এ কাজটা এতদিন করে নাই। এখন ছেলে দুটির কোনো দিন তেল মাখানো হয়, কোনো দিন হয় না, এবং ক্ষুধার জ্বালায় না চেঁচাইলে আর ছেলে দুটিকে খাওয়ানোর কথা তাহার মনেই পড়ে না। বড় বৌ এইগুলি দেখে আর আপন মনে গজ্ গজ্ করে। কলহও দুই এক দিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মেজ বৌ এমন কড়া-কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিল যে, তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত চুপ করিতে হইয়াছিল। বাস্তবিকই মা যদি নিজের ছেলের যত্ন না করে তাহার বলিবার কি থাকিতে পারে?

ওদিকে শিবরতনের সন্ধ্যাহ্নিক ও জলযোগের ভারটা জয়া এবং সে না থাকিলে মেজবৌ করিত। গিরিবালা ছোট মেয়ে, তাহার খেলাধূলা আছে। সকল সময় এই কাজটির কথা তাহার মনে থাকে না। শাশুড়ী জীবিত থাকিতে বড় বৌ-এর পাড়া বেড়াইবার উপায় ছিল না। এখন নিরঙ্কুশভাবে সে সে-কার্য্যটা সারিয়া লইতেছে। তাহারও সকল দিন মনে থাকে না। কোনো দিন ফিরিয়া আসিয়া দেখে শিবরতন অন্ধকার ঘরে চোখ বুঁজিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া আছেন, কোনো দিন

বা বাহির হইয়া গিয়া নদীতীরেই তিনি সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন আচরণ তবে সুবিধার কথা এই যে, শিবরতন চিরদিন শান্ত-প্রকৃতির মানুষ। এ সম্বন্ধে তাঁহার কাছে বড় বৌকে কোনো দিন কোনো অনুযোগ শুনিতে হয় না। শুনিতে হয় গিরিবালাকে। শিবরতন যেদিন নদীতীরে সন্ধ্যা সমাপন করিতে যান, সেদিন বড় বৌ-এর কাছে তাহার লাঞ্ছনার বাকী থাকে না। কিন্তু গিরিবালা বাপের ধাত পাইয়াছে। সে কোনো দিন স্বল্প কথায় দুই একটি কড়া কথা শুনাইয়া দেয়, কোন দিন বা কোনো জবাব না দিয়াই নিজের কাজে চলিয়া যায়।

কিন্তু এ বিভ্রাট বেশী দিন চলিল না। ধীরে ধীরে সব কাজেই সকলে অভ্যস্ত হইয়া গেল। খুব শান্তিতে না হইলেও দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। অবশেষে একদিন গোলযোগ বাধিল তুচ্ছ গোটা কয়েক বাঁশের পাতার জন্য।

হ্যাঁ, বাঁশের পাতার জন্যই।

খিড়কীর চারদিক আচ্ছন্ন করিয়া মৈত্রদের এক ঝাড় বাঁশ আছে। নানা কারণে তাহা আর বিভাগ হয় নাই। এই বিশাল ঝাড়ের পাদদেশ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শীতকালে ইহার ঝরা পাতায় খিড়কীর পুকুরের জল কদর্য্য হইয়া উঠিত এবং কি শীত কি গ্রীষ্ম ইহার কৃপায় পুকুরের জলে, কোনো কালে সূর্য্যালোক পড়িত না। তথাপি বাঁশের অশেষ উপকারিতার কথা স্মরণ করিয়া মৈত্র বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সকল নীরবেই সহ্য করিতেন।

একদিন খিড়কীর ঘাটে নামিবার সময় বড় বৌ দেখিলেন বাগদীদের

বাড়ীর গোরুর রাখাল এক একটা বাঁশ নীচু করিয়া ধরিতেছে আর একপাল গরু পরমানন্দে পত্র ভক্ষণ করিতেছে।

ব্যাপারটা কিছুই নয়। এবং বড় বৌও এমন প্রকৃতির নয় যে, গোটা কতক বাঁশের পাতার লোকসান সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু কিছু একটা লইয়া কারণে-অকারণে খানিকটা উত্তেজনা প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব।

তিনি এ ঘাট হইতে হাঁকিলেন, ওখানে বাঁশের পাতা খাওয়াচ্ছে কে রে?

বাগচীদের রাখাল আত্মপরিচয় দিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়াই উত্তর করিল, আজ্ঞে মা ঠাকরুন, গোটা কতক বাঁশের পাতাই তো?

—সে আমি জানি রে হারামজাদা, তুই নাম।

রাখাল দেখিল মা ঠাকরুণ রাগিয়া গিয়াছেন। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে বাঁশ গাছ ছাড়িয়া দিয়া গোরুগুলাকে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে অন্য দিকে লইয়া চলিল।

রাখালটা চলিয়া যাইতেই বড় বৌ পিছন ফিরিয়া দেখিল, মেজ বৌ খিড়কীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বড় বৌ-এর চোখে চোখ পড়িতেই সে নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

বড় বৌ-এর ঘাটে কাজ সারা হইল না। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া মেজ বৌকে উদ্দেশ করিয়া ঝঙ্কার দিল, আত্মীয়তা দেখাতে হয়, নিজের জিনিষ দিয়ে দেখাও। সাজার জিনিস নিয়ে অমন আত্মীয়তা দেখানো ভালো নয়।

দুটা তুচ্ছ বাঁশের পাতা লইয়া খিড়কীর ঘাটে বড় বধূর আচরণ মেজ বধূর ভালো লাগে নাই। এখন সেই তুচ্ছ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার খোঁটা দেওয়ায় সেও জ্বলিয়া উঠিল।

বলিল, তা দেখাবো নাই বা কেন? ওতে কি আমার ভাগ নেই। আমার ভাগ আমি যাকে খুশী দোব।

—দিবি? কিন্তু তোর তো একার নয়। আমি আছি, জয়া আছে,—

জয়া রান্নাঘরে ছিল। হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, আছিই তো। কিন্তু দুটো তুচ্ছ বাঁশের পাতা, ও নিয়ে আর সকাল বেলায়··

বড় বৌ ঝাঁকিয়া উঠিল, তাই বটে। তোর কি লো? বাঁজা মানুষ, সর্ব্বস্ব ঢেইয়ে দিলেও তোর গায়ে লাগবে না, কিন্তু আমার তো তা নয়।

বড় বৌ ক্রমাগত বকিতে লাগিল এবং একবারও স্মরণ করিল না যে, ছেলে তাহারও নাই। শুধু একটিমাত্র মেয়ের সুযোগ লইয়াই সে জয়ার একেবারে মর্ম্মস্থলে ঘা দিয়াছে।

পল্লীগ্রামে পনেরো পার হইলেও যাহার ছেলে হয় না তাহাকেই বন্ধ্যা বলে। এবং তখন হইতেই শাশুড়ী অথবা তৎস্থানীয়া মহিলাগণ তাহার গলায়, বাহুতে দেহের অন্যান্য স্থানে অব্যর্থ মাদুলী বাঁধিতে আরম্ভ করেন। বৎসরের অধিকাংশ কাল কলিকাতায় থাকার জন্য জয়াকে এ দুর্ভোগ পোহাইতে হয় নাই। এবং শ্বশুরালয়েও এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু কেহ এ সম্বন্ধে

কিছু বলুক আর না বলুক, যে আকাঙ্ক্ষা সে সকলের দৃষ্টির অগোচরে আপনার মনেমনে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে লালন করিতেছিল সেইখানে আঘাত পাইয়া সে একেবারে কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকৃতিস্থ হইয়াই সে একেবারে বাঘিনীর মতো গর্জ্জন করিয়া বলিল, ছেলে থাক্, না থাক, আমাদের জিনিস আমরা যাকে খুশী বিলিয়ে দোব তাতে আপনার কি বলুন তো?

বড় বৌ চীৎকার করিয়া বলিল, আমার কি? ভাগের ভাগ ক'রে নে নিয়ে যাকে খুশী দে। সাজার জিনিস দিতে গেলেই আমি বলবো।

জয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, তাই হবে। ভাগ যখন হ'লই তখন সব জিনিসের চুল চেরা ভাগ হওয়া দরকার।

বলিয়া উনানে জল ঢালিয়া দিয়া শোবার ঘরে প্রবেশ করিল।

১৫

অতি বড় শত্রুও মেজ-বৌর দোষ দিতে পারিবে না। সেই সকাল হইতে অন্ততঃপক্ষে বার আষ্টেক বন্ধ দরজা নাড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু জয়া সেই যে খিল আঁটিয়া শুইয়া পড়িয়াছে তাহার পর না করিল সাড়া-শব্দ—না কহিল একটি কথা। ঘুমাইয়াছে কি জাগিয়া রহিয়াছে বাহির হইতে কিছুই আন্দাজ করিবার জো নাই।

ইতিমধ্যে রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম মিটাইয়া লক্ষ্মণকে লইয়া পড়িয়া তাহার সহিত হিজি-বিজি বকিতে বকিতে মেজ-বৌর নিজেরও একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছিল। হঠাৎ ধড়মড় করিয়া জাগিয়া দেখে রোদ উঠানের শেষপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বাহিরে গিরিবালা নিরতিশয় বিষণ্ণ-মুখে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মেজবৌকে দেখিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিল, কি হল ন' খুড়ীমার? ওঠে না, নড়াচড়া নেই,—মাকে জিজ্ঞাসা করলে সেও কিছু বলে না—

জবাব না দিয়া মেজবৌ দ্রুতপদে জয়ার ঘরের সামনে গিয়া বলিল, দোর যদি এখনো না খুলিস ন'বৌ, এইবার মাথা খুঁড়ে মরব। এক্ষুণি তোর ভাসুরকে ফিরবে। পাড়াময় আর কেলেঙ্কারী করিসনে বলছি।

কোন অবস্থায় লোক জানাজানি হইতে দেওয়াটা জয়া একেবারে পছন্দ করে না একথা বাড়ীশুদ্ধ সবাই জানিত। হইলও তাহাই। জয়া নিঃশব্দে উঠিয়া খিল খুলিয়া খাটের উপর বসিল।

মেজবৌ কণ্ঠস্বরে দরদ ঢালিয়া কহিতে লাগিল, এই আষাঢ়ের এত বড় বেলাটা বাসিমুখে রয়েছিস, বলিহারী তোর আক্কেলটা ন'বৌ।

ঠাকুরপো বাড়ী এসে সমস্ত শুনে কি বলবে বলত—যে, বাড়ীতে একটা প্রাণী নিরম্বু উপবাসী রইল কেউ একবার তাকিয়ে দেখলে না—

ক্ষণকাল চুপ করিয়া জয়ার দিকে চাহিয়া মেজবৌ বোধ করি তাহার মনের ভাবটা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল, তা বুঝি বোন, যে কথাটা মিথ্যে নয়। সকাল থেকে এত কাণ্ড করলে—তবু হাজার হোক তুমি বয়সে বড়, তোমার মেয়ের বয়সী বল্লেই হয়, মানুষটা মরল কি খাকল একটা বার তাকিয়ে দেখতে নেই? আবার তাও বলি, ভগবান সবাইকে সব কিছু দেন ন. তাই নিয়ে এত বড খোঁটা দেওয়াই বা কেন, আর দেমাকই বা এত কিসের? একটা মেয়ে আছে বলেই না এত, এই ত সেদিন সে মরতে বসেছিল আব একবার তেমন হতে কতক্ষণ?

জয়া অন্যদিকে চাহিয়াছিল, শিহরিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, ওসব অলক্ষুণে কথা কেন বল মেজদি—

মেজবৌ অপ্রতিভ হইল, কিন্তু থামিল না। বলিল, কথার কথা বলছি ন'বৌ। বড়াই কি অন্য লোকে করতে পারে না, না বলবার তাদের কিছু নেই? বলিয়া একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগিল—সর্ব্বস্ব গ্রাস করে বসে আছেন, উগ্‌রে দিতে হচ্ছে কিনা—আসল কথাটা হল তাই। তুই কলকাতায় পড়ে থাকিস, নিতে ছুঁতে আসিস না—তবু ভাগ ত সমান সকলেরই।

জয়া ক্লান্ত কণ্ঠে কহিল, থাকগে ও সব কথা—

মেজবৌ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, তা থাক কিন্তু এবারে

কলকাতায় যাবার আগে ঐ বাঁশ-বাগান ঘর-দোর-উঠোন সমস্ত চুল চিরে বাঁটোয়ারা করে যাবি। ঠাকুরপো আসবে এই শনিবারে? তাকে বলিস সব কথা। আমিও যা করবার করব।

তবুও জয়া উৎসাহ দেখাইল না দেখিয়া মেজবৌ অভয় দিয়া কহিতে লাগিল, দেখা শোনার জন্য তুই মোটেই ভয় করিসনে বোন। এ পচা গাঁয়ে তুই যদি না থাকতে চাস, থাকিস কলকাতায় যেমন আছিস। লোকজন থাকবে, তোর মেজ ভাসুর রইলেন, দেখা শোনার ভাবনা কি? বলিতে-বলিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, চুপ কর ন'বৌ, বড় গিন্নি ঐ চর পাঠিয়েছে। শত্তুর পুরীতে বসত হয়েছে আমাদের—

মুখ বাড়াইয়া জয়া দেখিল গিরিবালা শুষ্কমুখে উঠানের সেই দিকটায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষীণ হাসিয়া সে তাহাকে কাছে ডাকিল। বলিল, সকাল থেকে তুই কোথায় ছিলি রে?

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গিরিবালা বলিল, একবার মোটে গিয়েছি সই-এর বাড়ী, অমনি হেনো-তেনো কত কথা হচ্ছে—সকাল থেকে কোথায় ছিলি রে? তুমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সব দেখেছ কিনা ন' খুড়ীমা।

গিরিবালাকে টানিয়া আরও কাছে আনিয়া হাসিমুখে জয়া বলিল, বড্ড ঘুম এসেছিল, সত্যি। তুই বাড়ী এসে কি ভাবলি বল দিকি? মনে করলি বুঝি ন'খুড়ী মরেছে, আপদ গেছে—

গিরিবালা যেন কত বড় গিন্নি। ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, থাক; আদিখ্যেতায় আর কাজ নেই। রাজকন্যের ঘুম ভাঙল এতক্ষণে,

এখন দয়া করে দুটো মুখে দিয়ে আমাদের উদ্ধার করে দিয়ে যাও। রাঁধা ভাত শুকিয়ে চাল হয়ে উঠল।

মেজবৌ কথা কহিয়া উঠিল, ন'বৌর মন ভাল নেই—তুমি ঘরে যাও বাছা, কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে আর দিও না। এই বেলা মা বিষ ছড়িয়েছেন, এখন মেয়ে লেলিয়ে দিয়ে তিনি বুঝি পাড়ায় বেরোলেন।

গিরিবালা জয়ার মুখের দিকে এতক্ষণে ভাল করিয়া তাকাইল। সে মুখে কি দেখিল সেই জানে, স্তম্ভিতের মতো সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সকালের কলহের কোন বিবরণই সে জানিতে পারে নাই। মেজবৌ কহিল, ঘর-চড়াও হয়ে কোন্দল করতে এসেছ মা, একটু দয়া-ধর্ম্ম নেই? গুষ্টিশুদ্ধ সেই যে একটা লোকের পিছনে লেগেছ, একের পরে আর আসছ—কত বড় বেহায়া হলে মানুষে এ সব পারে।

গিরিবালা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, তুমি কেন বলছ মেজখুড়ী, ন'খুড়ীমা কথা কইতে পারে—

মেজবৌ একবিন্দু রাগ করিল না। হাসিয়া বলিল, তাই কি সব কথা পারে মা, সব পারা যায় না—পরকে দিয়ে বলাতে হয়। কেউ ৎ তোমরা কম নও। গিন্নী কোথাকার কোন বাঁশের পাতা, খড়-কুটো ছাইভস্ম নিয়ে বেহদ্দ করে শোনালেন। কর্ত্তা একদিন ভাদ্রবৌয়ের মাথায় ছেঁড়া জুতো দিয়ে এদেশ-সেদেশ নাম কিনলেন। দেশে লোক থাকলে সেদিন সেই জুতোর মালা গেঁথে গলায় ঝুলিয়ে দিত। এসব কি মুখ ফুটে বলবার কথা মা, না নিজের মুখে বলা যায়? বলিয়া মনের মত কথা শুনাইবার আনন্দে মেজবৌ সগর্ব্বে জয়ার দিকে

তাকাইল। কিন্তু জয়ার মুখ তখন একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা হইয়া গেছে।

ক্ষণপরে যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া জয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বেরিয়ে যা গিরি, চলে যা এখান থেকে—চলে যা বল্‌ছি। মেজবৌর মুখ হাসিতে ভরিয়া আসিল, জয়া তাহাকেও সম্বোধন করিয়া কহিল, আমার শরীর ভাল নয় মেজদি, আমি একটু একলা থাকব।

মেজবৌ প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে গেলে জয়া আরও অধীর হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, আমি আর বসতে পারছিনে, তুমি যাও, তোমার পায়ে পড়ি তুমি চলে যাও—বলিয়া তাহাদিগকে একরকম জোর করিয়া বাহির করিয়া দিয়া জয়া সশব্দে পুনরায় দরজা বন্ধ করিল।

বড়বৌ পাড়ায় যায় নাই, নিজের ঘরেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। গিরিবালা ফিরিয়া আসিলে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্লে?

অব্যক্ত স্বরে কেবল একটা কি কহিয়া অকস্মাৎ গিরিবালা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর মায়ের কোলের মধ্যে ঝপ করিয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুতে আর শান্ত হইতে চায় না।

বড়বৌ বলিল, জয়া গালমন্দ দিয়েছে বুঝি?

গিরিবালা ঘাড় নাড়িল।

—খেতে এল না?

তেমনি মুখ গুঁজিয়া থাকিয়া গিরিবালা বলিল, না।

—তা এত কান্না কিসের ? লক্ষ্মীমা, সব কথা বলো আমায়।

গিরিবালা মুখ তুলিল, কিন্তু জবাব দিল না। বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা নিঃশব্দে তাহার গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

বড় বৌ বিরক্ত হইয়া উঠিল।—কি হয়েছে তাই বলুন, পোড়ারমুখী।

কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে গিরিবালা টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল, ন' খুড়ীমা বাঁচবে না, তুমি তাকে কি বলেছ—সে মরে যাবে এবার—

কলহের ঝোঁকে অনেক সময় অনেক কথাই বড়বৌর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সেটা তাহার স্বভাবদোষ—কিন্তু জয়াব সঙ্গে আজ যাহা ঘটিয়াছে তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব, তেমনি মর্ম্মান্তিক। বছরের মধ্যে অধিকাংশ দিনই জয়া বাপের বাড়ী থাকিত, তবু বিবাহের পর সেই যে এতটুকু মেয়ে পরের ঘরে আসিয়াছিল কেবল সেই কয়টা দিনের মধ্যেই তাহাকে চিনিয়া লইতে বড়বৌর একবিন্দু বাকী ছিল না। ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, তবু মুখে সাহস দেখাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এরি মধ্যে লাগানো হয়ে গেছে ? কি বলেছি, মিথ্যে-মিথ্যে কি বানিয়ে বলেছে তোরে ? ভাসুর ফিরলে শতখানা করে তার কানে তোলা হবে—তারই ষড়্‌যন্ত্র হচ্ছে। অত ধর্ম্মে সইবে না রে, মাথার উপর ভগবান আছেন।

বড় বৌ চুপ করিল। মনে মনে বোধ করি কোন দিক হইতে ইহার একটা কঠোর জবাব প্রত্যাশা করিয়াছিল ; কিন্তু সে সম্ভাবনা না দেখিয়া পুনশ্চ আরম্ভ করিল, ভাসুর ন' বৌমা বলতে অজ্ঞান

সারাদিন পরে তেতে-পুড়ে তারা বাড়ী আসছে—এসে শুনবে যখন সেই ন'বৌমার কীর্ত্তি? তার জন্যে মনে একটু ভয়-ডর আছে? বাড়ী-শুদ্ধ লোক উপোষী, কচি মেয়েটা অবধি কিছু খায় নি, মানুষের একটু মায়া-দয়াও নেই? এমন বদরাগী উগ্রচণ্ডা মেয়েমানুষ যে সংসারে সে সংসার উচ্ছন্ন যাবে ছাড়া আর কি?

তবু সাড়া শব্দ নাই দেখিয়া বড়বধূ আশঙ্কায় সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। বলিতে লাগিল, মরণ কেবল আমারই হয় না, আমি হয়েছি সকলের দু চক্ষের বিষ। বিচার করে কেউ দেখবে না, একটা কথাও শুনবে না, যেই এসে বৃত্তান্ত শুনবে, এমনি কর্‌বে, যেন আমারই যত দোষ। পেটের মেয়েটাও পর হয়ে গেছে। আজ যদি আমার তারা বেঁচে থাকত। অকাল-মৃত তিনটি সন্তানের শোকে বড বৌ চোখে আঁচল দিয়া যথার্থই কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সহসা জয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই সমস্ত গোলমাল একনিমেষে থামিয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া জয়া বলিল, এক্ষুনি বাড়ী থেকে চলে যাব?

বড বৌ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল, কই, আমি ত চুপ করে আছি। কি করলাম আমি? কি শুনেছিস বল? মিছে কথা বলিস নে জয়া, ভাল হবে না।

সেকথা কানে না তুলিয়া তীব্রস্বরে জয়া বলিল, বড় গিন্নীর আক্কেল ভাল। সেদিন মেয়ে যমের ঘর থেকে ফিরেছে, সমস্ত দিন না খাইয়ে রাখা হয়েছে। গিরিবালার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, উঠে আয় হতভাগী, এমন করলে মরবি যে এবার।

বড়-বৌও গিরিবালাকে ঠেলিয়া জয়ার দিকে দিল। বলিল, তাই দেখ্ ত বোন্, কি জ্বালাতন হচ্চি এই ধাড়ী মেয়েটাকে নিয়ে। উঠে যা গিরি, তোর ন'খুড়ীকে নিয়ে শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে নি গে যা। বেলা কি আর আছে?

জয়া বলিল ,তুমিও খাও নি দিদি, ওঠো—

একগাল হাসিয়া বড বৌ বলিল. তা যাচ্ছি, সারাবেলা উপোষ করে গা'টা কেমন ঝিমঝিম কর্‌ছে। ওরে গিরি, তিনটে ঠাঁই করিস তবে— বলিয়া বড় বৌ উঠিয়া দাঁড়াইল।

১৬

গল্পে গল্পে খাওয়া বেশ চলিয়াছিল, হঠাৎ গিরিবালা বলিল, ন'খুড়ীমা, তোমার থালাটা নিয়ে এলে না ?

বড় বধূও বিস্ময়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, আচ্ছা ভোলা মন তোর জয়া, হাঁ করে গল্প গিলছিস, ক্ষিধে তেষ্টারও হুঁস নেই ?

জয়া হাসিয়া বলিল, বেশ ত হচ্ছিল দিদি, আর এই দুধটা খেলেই হয়ে যেত। গিরি পোড়ারমুখীর আর সবুর সইল না।

বড় বৌ মনে-মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, তা হোক। আমরা আস্তে-আস্তে অনেকক্ষণ ধ'রে খাব। তোর ভাত-টাত নিয়ে আয় এখানে।

জয়া তেমনি হাসিমুখে কহিল, আর যদি আমি মোটে না খাই ?

সন্দিগ্ধ স্বরে বড় বৌ কহিল, তা তুমি পার। তোমার গুণের কি সীমা আছে ?

একটু চুপ থাকিয়া ধীরে ধীরে জয়া বলিল, সত্যিই খাব না। ভাগ-বাঁটোয়ারা যখন হয়ে গেছে, তোমার ঘরে আমি কেন খাব ? তারপর বলিতে লাগিল, একদিন ছিল দিদি, ঝগড়া ক'রে তোমার পাত থেকে কেড়ে খেয়েছি। আজ যে এত যত্ন করছ তবু খাব না—খাব কেন ? বলিতে বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিল, চক্ষু সজল হইল, বলিল, দিদি এই সব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও। এতকাল বঠ্ঠাকুরের সঙ্গে ঘর করলে, মানুষটিকে চিন্‌লে না। এই বুড়ো বয়সে তোমরা ওঁকে খুন করে ফেলবে। সংসার যেমন ছিল তেমনি হোক। তোমার

পায়ে ধরে মিনতি করে বলছি দিদি, এই কথাটা তুমি বঠ্ঠাকুরকে বুঝিয়ে বোলো।

বড় বধূ সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না, জয়ার মুখের দিকে চাহিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল। আগ্রহভরা স্বরে জয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলবে ত?

বড় বৌ কহিল, বলতে হয় তুমি বোলো। পুরুষ মানুষের কথায় আমি কোনদিন থাকিনে—থাকবোও না।

জয়ার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, সে আমি জানি। তীব্রদৃষ্টিতে বড় বৌর দিকে চাহিয়া বলিল, কার জন্যে কি হচ্ছে জানতাম সবই, কিন্তু তুমি যে এত নীচ, এতখানি ছোট তাই কেবল জানতাম না। বলিতে বলিতে পিছন ফিরিয়া দ্রুতবেগে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল।

বজ্রাহতের মতো বড় বৌ ক্ষণকাল নিষ্পলক হইয়া রহিল। তারপর থালা ঠেলিয়া ভাত ছড়াইয়া তীরবেগে পেছনে পেছনে ছুটিয়া উঠান অবধি আসিল। বলিতে লাগিল, ও আবাগী, আর কি জানিস বলে যা। কার জন্যে কি হচ্ছে দশে-ধম্মে জানুক। মায়ে-ঝিয়ে পরামর্শ করে দিনরাত ঠাকুরপোর কানে বীজ-মন্তোর দিচ্ছিস। মুখে ভাসুর ভাসুর করলে হয় না, সবাইকে বঞ্চিত করে নিতাই চক্কোত্তির জমিদারী কিনছিস গোপনে গোপনে। বলে যা সেই সমস্ত কথা—

একে সমস্ত দিনের অনাহার তার উপর সকাল হইতে নিরন্তর এই ধরণের বকাবকিতে জয়ার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল; আর সে সামলাইতে পারিল না। বলিল, হ্যাঁ, কিনছি জমিদারী। এত দিন

মুখ চেয়ে না কেন। ভুল হয়েছে। শুধু জমিদারী নয়, নিতাই চক্কোত্তির বাড়ীটাও কিনব। কালে-ভদ্রে যদি কখন গাঁয়ে আসি তোমাদের মুখদর্শন না করতে হয় সে ব্যবস্থাও হবে।

বড় বৌ বলিল, মুখ দেখ্‌তে ঘেন্না করে বুঝি? আসুক সে-জন বাড়ী, দিব্যি দিয়ে দেব কালই যেন উঠোনের মাঝখানে বেড়া তুলে দেয়। ওলো, ভয় দেখাস্ কারে? কিনগে জমিদারী, কিনিস্ বাড়ী, কিনিস নি কেন এতদিন?

জয়া চলিয়া যাইতেছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, কেন যে কেনা হয় নি এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

কথার ভিতরের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা মনে পড়িয়া বড় বৌ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল।—কি, কি বল্লি তুই? সেই ক'টা টাকা দিয়েছিলি তারি খোঁটা দিলি?

জয়া বলিল, হাঁ তাই। কোথায় থাকত তোমার এত দম্ভ, কোথায় থাকত তাঁর চাকরী, কোন্ জেলে যেতে হত তাঁকে, একদিন ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত ভেবে দেখো। কিন্তু যাক সে সব, শুধু ভাগ-বাঁটোয়ারা নয়, তোমাদের মুখ দেখতে না হয় সেই ব্যবস্থা করে আমি ছাড়ব। এ দু' তিনটে দিন একটু রেহাই দাও—

বলিয়া কলহের মাঝখানে অকস্মাৎ ছেদ টানিয়া দিয়া জয়া চলিয়া গেল, বড় বৌর শত আক্রমণে আর প্রত্যুক্তি করিল না।

সন্ধ্যার পর শিবরতন ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত ঘরেই খিল পড়িয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপে আলো নাই, বাড়ীতে যে জনমানব কেহ বাস করে, ভাব দেখিয়া তাহা বুঝিবার জো নাই। ক্ষণকাল অন্ধকার উঠানে নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া কাসিয়া গলাটা পরিষ্কাব করিয়া ডাকিলেন, যোগীন !

জয়া নিঃশব্দে একটা আলো জলচৌকীর পাশে রাখিয়া গেল। পাশে জলভরা গাড়ু ও তাহার উপর ভাঁজ করা গামছা যথারীতি সজ্জিত রহিয়াছে। শিবরতন চৌকীর উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি যে কত বড পরিশ্রান্ত, বসিবার ধরণে তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

আহ্নিকের জায়গা করিয়া গিরিবালা ডাকিতে আসিয়া দেখিল, শিবরতন তখনও ধূলি-ধূসরিত পায়ে কাঠের মত আডষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, পা ধুইবার কথা তাঁহার বোধ করি মনেই নাই। মেয়ের ডাকে শিবরতন যেন জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, সবাই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত কি বেশী হল গিরি ?

গিরিবালা কি জবাব দিল শিবরতনের তাহা কানেই ঢুকিল না। অনেকটা যেন আপনার মনেই বলিয়া উঠিলেন, বারো ভূতে মিলে সব ছারেখারে দেবে—সে হবে না। চালাকী পেয়েছে ? গিরি, ডাক দিকি তোর ন' খুড়ীমাকে।

গিরিবালা বলিল, ন'খুড়ীমা এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন।

—আছেন বুঝি। উৎসাহের আবেগে শিবরতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিতে লাগিলেন, শোন ন' বৌমা, বিভূতিকে চিঠি লিখে দিলাম সে

বাড়ী আসুক। এত কষ্ট করে সোনার হাট জমিয়ে তুললাম—তখন কে কোথায় ছিল? সংসার আমার—কারো কথা শুনব না। তুমি শক্ত করে হাল ধর দিকি, মা। যার না পোষাবে দূর করে দেব বাড়ী থেকে—চালাকী পেয়েছে? তুমি কড়া হাতে হাল ধর তো—

বাপের আহ্নিকের কোশাকুশী ও আসন পাতিয়া দিয়া গিরিবালা আবার বাহির হইতেছিল। তীক্ষ্ণস্বরে বড় বৌ বলিল, পোড়ার-মুখী আবার চল্লি কোথায় শুনি?

গিরিবালা মায়ের দিকে একবার কটমট চোখে চাহিয়া যেমন যাইতেছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল।

বড় বৌ কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, পেটের মেয়েও পর হয়ে গেল। আমায় যেন নখে টিপে মারতে চায়। দিনরাত ন' খুড়ীর সঙ্গে ফিস-ফাস। পরামর্শ দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকেও পর করে দিলে।

গিরিবালা তখনই ফিরিয়া আসিল। হাতে রেকাবীর উপর খান কয়েক লুচি, দুই একটা মিষ্টি ও আরও কি কি। পাত্রটি সাবধানে নামাইয়া রাখিয়া শান্তকণ্ঠে গিরিবালা কহিল, ফিসফাস করতে যাইনি মা, ভাগ্যিস্ ন' খুড়ী এই ক'খানা করে রেখেছে নইলে বাবাকেও যে নিরম্বু থাকতে হত।

বড় বৌ চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িল।—ওর এককুচি মুখে ফেলেছ কি তোমার সামনে এক্ষুনি আমি আত্মঘাতী হব। ওরা আমাদের খাওয়াচ্ছে—পরাচ্ছে—টাকা দিয়ে তোমায় জেল থেকে বাঁচাচ্ছে। সর্ব্বস্ব বিক্রী করে ওর দেওয়া সেই সাতশ' ফেলে দাও আগে—

বিস্ময়ে শিবরতনের চোখে পলক পড়িল না। বলিলেন, কার কথা বলছ বড় বৌ?

—তোমার ন' বৌমার। সব গিয়ে আমার এই একটা গুঁড়ো আছে—মা হ'য়ে আমি এই মেয়ের দিব্যি দিয়ে বলছি তুমি যদি ওদের একটা কোন জিনিষ ছোঁও এই মেয়ের মাথা খাবে।

স্বামীর অপমানের কথা স্মরণ করিয়া বড় বধূ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিতে লাগিল, না খেয়ে যখন ভাইকে খাইয়েছো, আমার গায়ের গয়না ছিনিয়ে নিয়ে ভাইয়ের স্কুলের মাইনে জুগিয়েছ—দুঃখের দিনে কোথায় ছিল এরা সব? টাকার খোঁটা দিল, কিন্তু তোমার সারাজন্মের রোজগার কোন্ দিক দিয়ে কি হ'ল তার হিসাব জানে কে?

শিবরতন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিবালা তিক্ত-কণ্ঠে কহিল, আর একটু দেরী করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত মা? ন' খুড়ীমা না খেয়ে পড়ে আছে—বাবারও তাই ঘটালে?

শিবরতন চমকিয়া বলিলেন, ন' বৌমা আজ খান নি?

একটু নরম হইয়া অপ্রস্তুতের ভাবে বড় বৌ বলিল, না। সাজার বাঁশ-বাগান নিয়ে বেধেছে আজ। সমস্ত চুল-চেরা ভাগ না হয়ে গেলে তিনি খাবেন না কিছু।

শিবরতনকে সংযম হারাইতে কোন দিন কেহ দেখে নাই। তাহা হইলে, একেবারে নিঃস্ব অবস্থা হইতে এই রকম নাম-ডাক ও এত বড় সংসার গড়িয়া তোলা কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু আজ তাঁহার কি হইল। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বারংবার

প্রশ্ন কবিতে লাগিলেন, কি বলছিস গিবি? ন' বৌমা সমস্ত দিন খান নি? না খেয়ে পড়ে আছেন ন'মা আমাব?

অন্ধকাবে হোঁচট খাইযা সুপ্রশস্ত উঠানেব আব এক প্রান্ত অবধি ছুটিয়া ঘবেব সম্মুখে আসিয়া শিববতন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তুমি যা চাও তাই হবে ন'বৌমা, বিভূতিকে আসতে লিখে দিয়েছি। সমস্ত ভাগ হয়ে যাবে, কিচ্ছু বাকী থাকবে না—আমি তোমাকে এই কথা দিলাম। আমি মিথ্যাবাদী নই সেত তুমি জানো, তুমি ওঠো—

বলিযা টলিতে টলিতে শিববতন ফিবিযা আসিযা বিছানায শুইয়া পড়িলেন। খাবাব যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া বহিল। যোগীন তামাক লইযা আসিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইযা ফিবিযা গেল।

১৭

সকালবেলা অকস্মাৎ শম্ভুরতন বড়বৌর ঘরে ঢুকিয়া ধপ্ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। বলিল, কি উৎপাত বল ত। দাঁতন ভেঙে নিয়ে দাওয়ায় বসেছি, এক নম্বর এলেন বাগ্‌চী মশায়। তাঁর পিঠ পিঠ রাখাল। শেষকালে দেখি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে তিনু ভট্‌চাযও এসে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উঠল। ভট্‌চায বাতের বেদনায় আজ ছ'মাসের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারে না, সেও বেরিয়ে এসেছে—

শম্ভুকে একনজর দেখিয়াই বড়বৌ মশারা খুলিতে লাগিয়াছিল। কিন্তু বৃত্তান্ত যে প্রকার ঘোরতর তাহার মধ্যে কাজ করা চলিল না। প্রচুর হাসিতে হাসিতে শম্ভু বলিতে লাগিল, গতিক দেখে আমি গাড়ু হাতে উঠে পড়লাম। দাদার নজর এড়ানো দায়, ঠিক ধরে ফেলেছেন, বল্লেন, অমনি অমনি পাড়ায় বেরিয়ে পোড়ো না যেন, শম্ভু। আমি জবাব না দিয়ে দে ছুট—

বলিয়া ছুটাছুটির ক্লান্তিতে শম্ভু একদম বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল। একটু চুপ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিভূতি শনিবারে আসছে?

নিস্পৃহভাবে বড়বৌ উত্তর দিল, তাইত শুনছি—

—দাদাকে কোন খবর পাঠিয়েছে নাকি? কাল বিকেলে নিতাই চক্কোত্তি এসে অনেকক্ষণ কি সব বলছিল। শুনলাম, সে বিভূতির ওখানে গেছল—

বড়বৌ বলিল, কি জানি—

হুঁ—বলিয়া শম্ভু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আবার যখন

কথা বলিল তখন স্বর তাহার উত্তপ্ত হইয়া গেছে। বলিল, কিন্তু কে কি বলেছে তাই নিয়ে দাদাও ক্ষেপে উঠলেন? ন'বৌমার টাকা ফেলে দিলেই ত চুকে যায়। এই মাসের মধ্যেই যেমন করে হোক আমি সমস্ত টাকা দাদার হাতে এনে দেব—এই আমি বললাম—

বড়বৌ জবাব দিল না।

শম্ভু অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, কথা বলছ না যে। দাদাকে বুঝিয়ে বলো সব—

বড়বৌ বলিল, তোমার কথা তুমি গিয়ে বলো।

—তাই পারা যায় বুঝি?—শম্ভু ম্লানমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল, বলবার তো কত কথাই আছে। এই যে লোকজন ডেকে ওমাজমি জিনিষ পত্তোরের ফন্দ করা হচ্ছে—বেশ, বিভূতি যা বলবে তাই হবে, আমি একজন শরিক নই, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়? একটা মুখের কথা না বলে আলাদা করে দেওয়া—পরম শত্রুরেও এমন করে না, আর উনি কিনা বড় ভাই হয়ে তাই করলেন—

বড় বৌ আর একটু থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শম্ভু বলিল, যাচ্ছ কোথায়? শোন বৌদি, আমিও ছেড়ে কথা কইব না। আসুক বিভূতি শনিবারে বোঝাপড়া তার সঙ্গে। কিন্তু তার আগে তোমাদেরও স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, ঐ মেজবৌর ভাগে আমায় ফেলে দিয়ে তোমরা সব যে বেহাই পাবে সে'টি হচ্ছে না। আমি মতলব ভেঁজে রেখেছি—

বলিয়া ঘর কাঁপাইয়া শম্ভু প্রবলবেগে হাসিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু এদিকে চিন্তার কারণ আরও অধিক হইয়া দাঁড়াইল। শনিবারে বিভূতি বাড়ী ত আসিলই না, তারপর দিন তিন-চারের মধ্যে না লিখিল চিঠিপত্র না পাঠাইল একটা কোন সংবাদ। আবার উড়ো খবর পাওয়া গেল, কলিকাতায় এই সময়টা মায়ের অনুগ্রহ বড় অধিক পরিমাণে হইতেছে। অথচ বাড়ীর কর্ত্তা শিবরতন পরম নির্ব্বিকার ভাবে বণ্টন পত্রের মুশাবিদা করিতে লাগিয়াছেন। এবং বাড়ীর মধ্যে জয়া ভিন্ন অপর কাহারও যে আহার-নিদ্রার তিলার্দ্ধ ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহার পরিচয় নাই।

বড়বৌর সঙ্গে আলাপ বন্ধ। গিরিবালাও ভুল করিয়া উঠানের এই প্রান্তে আসে না। তাহার উপর নিঃসন্দেহ অতি কঠোর নিষেধ জারী হইয়াছে। জয়া অগত্যা রামের শরণ লইল। রাম তখন অতিশয় ব্যস্ত, জামরুল ডালে দোলনায় দুলিতে দুলিতে আনন্দাতিশয্যে চোখ বুজিয়া আছে। সেই চোখ খুলিয়া কথা শোনান নিতান্ত সহজ নয়।

জয়া অনুনয় করিতে লাগিল, লক্ষ্মী বাপ আমার, যা বলছি শোন - দুটো পয়সা দেবো—

অনেক বলাবলির পর রাম সংক্ষেপে উত্তর দিল, তুমি সরো ন'খুড়ী, কালকে যাবো—

জয়া হাসিয়া বলিল, কি পাগল ছেলে রে, এক্ষুনি দরকার—

রীতিমত বিরক্ত হইয়া রাম পলকের জন্য চোখ মেলিল। বলিল, পারবো না—

—চারটে পয়সা দিচ্ছি, লক্ষ্মী মাণিক আমার—বাখালের বাড়ী আর কতক্ষণের পথ?

লক্ষ্মীমাণিক তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া বলিল, দাও। এবং পয়সা কটি হাতে পাইয়াই লাফাইয়া পড়িয়া বায়ুবেগে ছুটিল।

চোখে চশমা আঁটিয়া শিবরতন বাগ্‌চী-মহাশয়ের সঙ্গে পুরানো দলিল পত্র বাছাই করিতেছিলেন এমন সময় রাখাল আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কলকাতায় যাচ্ছি। ন'বৌদি বড্ড ধরেছেন, তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

শিবরতন মুখ তুলিয়া বলিল, বিভূতিকে আনতে যাচ্ছ বুঝি? এক্ষুনি যাবে?

—হ্যাঁ।

প্রহরখানেকের মধ্যে রাখাল রওনা হইয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বড় মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। জয়া প্রদীপ জালিয়া একেলা ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কতক্ষণ ধরিয়া এমনি বসিয়া আছে, খেয়াল নাই। সহসা শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখে, ঠিক পিছনটিতে বিভূতি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

এক মুহূর্ত্ত জয়া বিমূঢ় হইয়া গেল। তারপর লক্ষ্য হইল, বিভূতির কাপড় জামা সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে, মাথা দিয়া জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। কাছাকাছি কোথাও কিছু না দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া স্বামীর মাথা মুছাইল। মৃদু হাসিয়া কহিল, একটা ছাতা আনতে পারনি?

শুক্‌না কাপড়ের মধ্যে পাওয়া গেল একখানি চওড়া লালপাড় শাড়ী। বিভূতির দু'একখানা ধুতি যা বাড়ীতে থাকে সে সব কোথায় চাপা

পড়িয়া আছে। শাড়ী বাহির করিয়া দিয়া জয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিভূতি শিহরিয়া উঠিল।—এ যে মেয়ে মানুষের কাপড়।

হুকুমের সুরে জয়া বলিল, পরো বলছি এক্ষুনি। গায়ে জল বসছে।

অতএব পরিতে হইল। জয়া বলিতে লাগিল, সমস্ত পথ ভিজে এসেছ। অসুখ না করলে বাঁচি। পথে কোথাও দাঁড়ালে হত কি রকম যেন তুমি—

বিভূতি কহিল, তাই বুঝি দাঁড়ান যায়।

—তার মানে?

—মানে আর বলে লাভ নেই। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আর জন্মে তুমি যেন পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মাও। তখনি বুঝবে—

জয়া বলিল, থামো।

কিন্তু বিভূতি থামিল না। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, বৃষ্টি বাদলার কথা বলছিলে জয়া, মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে—আমি ত জানতেই পারিনি। ষ্টেশন থেকে দৌড়ে দৌড়ে এসেছি। সমস্ত পথ কেবল ভেবেছি—

জয়া বিভূতির মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিমুখে বলিতে লাগিল, থাক, থাক—আর বলতে হবে না, জানতে কিছু বাকী নেই। শনিবারে আসা হল না, একখানা চিঠি দিলে বুঝি অনেক পয়সা খরচ হয়ে যেত?

—তুমি খুব ভাবছিলে, না?

জয়া ভালমানুষের মতো ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না তো—

—কিন্তু দেখলাম, ঠিক দুর্গা প্রতিমার মতো তুমি বসে আছ, আমি ঘরে ঢুকলাম, টেরও পেলে না—

আদরে স্নেহে স্নিগ্ধকণ্ঠে জয়া বলিতে লাগিল, তোমাকে কে টেনে এনেছে জানো মশাই? আমি—আমি—। ষ্টেশন থেকে ছুটিয়ে কে এনেছে জানো তা? তোমার খবর নেই, এ দিকে এই কাণ্ড—কি ভাবনাটাই ভেবে মরেছি—

—এ দিকে কি?

—কিছু না। বলিয়া জয়া চুপ করিল। কোন ক্লেদ তুলিয়া এই মুহূর্তটিকে মলিন করিতে তাহার মন সরিল না।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ঘর-কানাচে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, সিক্ত বাতাসে ঘরের মধ্যে সেই গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।

বিভূতি বলিল, খবর না দেওয়া খুব অন্যায় হয়ে গেছে জয়া, কিন্তু স্মরণ করে উঠতে পারিনি। আফিসে অডিট হচ্ছে, বড্ড খাটুনি—

জয়া স্বামীর হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, তাই কি রকম রোগা হয়ে গেছ,—চাকরী তুমি ছেড়ে দাও—

—দেবো, নিশ্চয় দেবো—সেই যোগাড়ে আছি। বলিয়া বিভূতি থামিল। একটু পরে বলিল—সমস্ত দিনের মধ্যে ফাঁক নেই। রাত্তিরে চিঠি লিখব—তা পরিশ্রমের পর একটু স্থির হয়ে বসলেই চোখ জুড়িয়ে আসে।

ঘুম আজকাল হয় তা হ'লে? জয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। নূতন বিয়ের পর যে কথাটা বিভূতি প্রায়ই বলিত দুজনেরই

তাহা মনে পড়িয়া গেল। লজ্জিত মুখে বিভূতি কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে যোগীন ডাকিল, বড়বাবু চণ্ডী মণ্ডপে বসে আছেন, একবার ডাকছেন—।

জয়ার মুখের হাসি মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। বিভূতি জিজ্ঞাসা করিল আসতে না আসতে জরুরী তলব। ব্যাপার কি জয়া?

জয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল, জবাব দিল না।

বিভূতি মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহার চোখ দুটি ছলছল করিতেছে। গভীর স্নেহে জয়ার মাথাটি বুকের উপর তুলিয়া লইয়া আর্দ্র কণ্ঠে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কি হয়েছে বলবে না আমায়?

জয়া কথা কহিতে পারিল না, স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া অব্যক্ত স্বরে কহিল, আমায় ওঁরা ত্যাগ করেছেন—

—সে কি?

জয়া বলিতে লাগিল, বাড়ীর মধ্যে কেউ আমায় দেখতে পারে না। আমারই যেন যত দোষ। কথায়-কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া, বিনি দোষে আমায় অপমান করে—। তারপর চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিয়া হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, আমার একটা কথা তুমি রাখবে?

বিভূতি কিছু না বলিতেই অধীর হইয়া জয়া বলিতে লাগিল, বড় গিন্নী আমায় বেহদ্দ অপমান করলেন। ব্যাপার কি? না কয়েকটা বাঁশের পাতা। বলিতে বলিতে বিভূতির হাত ধরিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিল—তুমি আমায় একটা ভিক্ষে দাও—

ব্যথিতভাবে বিভূতি বলিল, তোমার অপমানে আমারও অপমান হয়, জয়া। তুমি অমন কোরো না। কি করতে হবে, আমায় বল।

জয়া বুঝাইতে লাগিল, এতদিন আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়ে খাচ্ছিল—এখন ভাগ দিতে গিয়ে বড় বাজছে বড় গিন্নীর। তাই এত কথা ওঠে।

বিভূতি ঘাড় নাড়িল।

কর্ত্তা ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা নিয়ে ডাকছেন। তুমি মুখের উপর বলে দিয়ে এস, আমরা চাইনে ওসব কিছু। বাঁশ-বাগানের ত্রিসীমানায় আমরা যাব না। বড় গিন্নী হাত মেলে ভোগ করুন!

মৃদু হাসিয়া বিভূতি কহিল, এতে কি বড় গিন্নী খুব জব্দ হবেন মনে কর?

জয়া হাত মুখ নাড়িয়া কহিল, এ না করলে কি তিলার্দ্ধ এ বাড়ীতে আমায় টিঁকতে দেবে? কম শত্রুতা করছে? তুমি জান না, তাই। আজ ছ'দিন গিরিকে আটকে রেখেছে, এ-মুখো হতে দেয় নি। বলিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিতে লাগিল, কি হবে এই ছাই-ভস্ম নিয়ে? আমাদের কি দু-পাঁচটা ছেলে মেয়ে আছে? কার জন্যে কথা শুনতে যাবো? দু'জন আমরা, না হয় ভিক্ষে করবো। আমি এ সব সইতে পারছিনে। পায়ে পড়ি, তুমি আমার কথা শোন। বলিয়া সত্যসত্যই বিভূতির পা জড়াইয়া ধরিল।

হাত সরাইয়া দিয়া বিভূতি বলিল, তাই হবে জয়া। একটু চুপ থাকিয়া গভীর কণ্ঠে আবার বলিল, তুমি যা বললে তাই করব। এখানে না থাকতে চাও, তার ব্যবস্থাও করতে পারব।

স্নেহে শ্রদ্ধায় গলিয়া গিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাসিমুখে জয়া বলিতে

লাগিল, তাই হয় বুঝি। বাপের বাড়ী দু'চার দিন থাকি সে এক কথা। তা বলে মৈত্র বাড়ীর বৌয়ের আর কোথাও বসতি করবার জো আছে? সে হয় না। না মরলে নিস্তার নেই। নইলে আর ভাবনা ছিল কি?

১৮

ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় চোখ মেলিয়া জয়ার মনে হইল সমস্ত বুকখানা একেবারে পালকের মত লঘু হইয়া গেছে, ক'দিন ধরিয়া যে দুর্ব্বিষহ পীড়নে ভিতরে ভিতরে অন্তর নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইতেছিল—তাহার এক বিন্দু আর অবশিষ্ট নাই। পাশের মানুষটির তখনও চেতনা নাই। মুহূর্ত্তকাল জয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর আস্তে আস্তে পদপ্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া চলিয়া যাইতেছে—

পিছন হইতে বিভূতি ডাকিল, পালাও কেন—ও জয়া, আশীর্ব্বাদটা নিয়ে য'ও। অর্থাৎ তাহার সকল কীর্ত্তি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। জয়া ছুটিয়া পলাইল।

ক্ষণপরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি যে কোথায় যাবে বলেছিলে, খাবার খেয়ে তারপর যাবে তো?

বিভূতি শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ইস্ বোদ উঠে গেছে খাওয়া দাওয়ার সময় হবে না আর।

জয়া জেদ করিয়া বলিল, তা হোক। কুটুম্বের বাড়ী উয়্যুগ আয়োজন করতে দেরী হয়ে যাবে, পৌঁছুতেও বেলা হবে।·· আচ্ছা, মা যে মায়ার বিয়ের জন্যে এরই মধ্যে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন?

—কি জানি, হয়ত ভাবলেন, উনি ব্যস্ত না হলে যদি আবার দিদির মতো শেষকালে মায়া নিজেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—তোমার গলা ধরে বলতে গেছলাম কি না যে, আমি খুব ব্যস্ত হয়েছি। বলিয়া বড় রাগ করিয়া হাসিমুখে জয়া বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে মেজবৌ আসিয়া রান্নাঘরে জয়ার কাছে পিঁড়ি টানিয়া বসিল। বলিল, ঠাকুরপো কোথায়?

জয়া জানাইয়া দিল, বাড়ীতে নাই।

—কি কাণ্ড করেছে শুনেছিস?

নিরুপায়ের মত যেন জয়া বলিল, কত শুনব মেজদি, ওঁকে নিয়ে আর পারা গেল না।

—শুনিস নি নিশ্চয়। তা হলে আর অমন হাসতে হত না। কাল বঠ-ঠাকুরকে নাকি বলে দিয়েছে বাঁশঝাড় বাগবাগিচা কোন কিছুরই ও ভাগ নেবে না। গ্রামের দশজনের সামনে কথাবার্ত্তা হয়েছে। ঠাকুরপো নাকি বঠ-ঠাকুরের পায়ে ধরে সাধাসাধি করেছে।

এত বড় সংবাদেও জয়ার হাসিমুখ একবিন্দু মলিন হইল না দেখিয়া মেজবৌ বলিল, বিশ্বাস করলি নে বুঝি।

অসঙ্কোচে জয়া উত্তর করিল, কেন করব না। ও সব করতে পারে, মেজদি।

মেজবৌ বলিতে লাগিল, ঠাকুরপো এলো, তা আমায় একটা

খবর দিতে হয়। আমি এসে সব বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিয়ে যেতাম। তা হলে কি এমন সর্ব্বনাশ হয়!

জয়া তেমনি হাসিয়া বলিল, আমার মনে ছিল না।

যোগীন আসিয়া বলিল, ন'মা, শোন—

বলিয়া আগাইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া মাটির উপর মুখবাঁধা লাল খেরোর একটা থলি রাখিয়া কহিল, বড়বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

এরূপ ঘটনা নূতন নয়। আবাদের বাঁধবন্দী ও অন্যান্য ব্যাপারের জন্য মাঝে মাঝে চৌধুরীদের সদর সেরেস্তা হইতে টাকা পাঠাইবার আবশ্যক হয়। সে টাকা পৃথক করিয়া শিবরতন জমিদার বাড়ী হইতে নিজের কাছে আনিয়া রাখিতেন, পরে মফস্বলের বরকন্দাজ আসিয়া লইয়া যাইত। লোহার সিন্দুক থাকিত জয়ার ঘরে, সে যখন এখানে থাকিত শিবরতন সরকারী টাকা ন' বৌমার কাছে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন।

জয়া এক নজর চাহিয়া বলিল, নিচ্ছি, একটু দাঁড়াও যোগীন।

তারপর আবার বলিল, গিরি কোথায়? তা'কে না হয় একটু ডেকে দাও, বাবা। আমার হাত জোড়া, সে এসে তুলে রাখুক।

মেজবৌ ব্যস্ত হইয়া বলিল, গিরিকে কি হবে? আমি যাচ্ছি, বোন। চাবি কোথায় বলে দে—আমি রেখে আসব।

জয়া হাসিয়া বলিল, চাবি কি তুমি খুঁজে পাবে মেজদি? পোড়ার-মুখী কোথায় রেখে গেছে সেদিন, আর পেলেও তুমি চাবি চিনতে পারবে না।

যোগীন বলিল, বড়বাবু বল্লেন, এখন আর হয়ে উঠল না। আজকে সন্ধ্যের মধ্যে সব টাকা শোধ করবেন।

কাজ ফেলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জয়া যে.
বলিল, বঠ-ঠাকুর কি বলেছেন ? এ কিসের টাকা ? ফেলিতে ফেলিতে

যোগীন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, এই চায় শো ঝাঁজে দিলেন , আর বাকি টাকা সন্ধ্যের সময় দেবেন।

আগের দিন রাত্রিতে বিভূতির সঙ্গে শিবরতনের অনেক আলোচনা হইযাছিল এবং দু'ভায়ের এই আলোচনা নিতান্ত চুপি চুপি হয় নাই। অনেক কথাই বাড়ীব ভিতরে জযার কানে পৌছিয়াছিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জয়া বলিল, বঠ-ঠাকুব বুঝি বাঁশ ঝাড়ের দরুণ দাম পাঠিয়ে দিলেন, যোগীন ?

যোগীন বলিল, তা আমি বলতে পারিনে—

জয়া আরও উচ্চ উগ্র ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলিল, ওঁদের বোলো যোগীন, বাঁশঝাড আমরা বিক্রী করি নি, দান কবেছি।

কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। শিববতন বাহির বাড়ীতে ছিলেন, ইতিমধ্যে কোন সময় তিনি নিঃশব্দে বাডীর মধ্যে আসিয়া দাঁডাইয়াছেন তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। শিবরতনই কথা কহিয়া উঠিলেন। কণ্ঠস্ববে এক বিন্দু উত্তাপ নাই, অতিশয় শান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, বাঁশঝাড়ের দাম নয় ন'বৌমা, তোমার কাছে আমার যে সাত শ' টাকা দেনা রয়েছে ! বিভূতির টাকার বড় দরকার। তবু সব এখনো যোগাড় হল না। সন্ধ্যের সময় রাজেশ্বরের কাছে একবার যাব। আজকের মধ্যেই সমস্ত পেয়ে যাবে, মা।

ক্ষণকাল অভিভূতের মতো জয়া সেইখানে বসিয়া রহিল। হঠাৎ উঠিয়া জোরে-জোবে পা ফেলিয়া ঘরে ঢুকিল। তারপর সিন্দুক খুলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া টাকা গণিয়া গণিয়া তুলিয়া আরও অনেক পরে

খবর দিতে হয়। তব আসিল তখন তাহার দু'টি চোখ জবাফুলের তা হলে কি এমন থাছে।

... তখনও চলিয়া যায় নাই। জয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, দেখলে মেজদি? এমন ভাসুর কোন জন্মে যেন কারো না হয়।

মেজবৌ ভালমন্দ জবাব দিতে না দিতে আবার জয়া বলিতে লাগিল, মাথায় জুতো তুলেও ক্ষোভ মেটেনি। এমনি করে শাস্তি দিচ্ছেন। ... যে সেদিন কথা কাটাকাটি হয়েছিল। বলিতে বলিতে সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল, আচ্ছা, গিরি যদি ঝগড় করত তাকে কি ওঁরা এমনি ক'রে ঠেলতে পারতেন?

মেজ-বৌ বলিল, আমি চিনি সবাইকে। তোরাই না কেবা ওঁদের জন্যে মরিস। কালকে কি কাণ্ড করলে বল দিরি। মেজ বাবু ত আমাদের দাদা বলতে অজ্ঞান, ভাবতাম ঠাকুরপোর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। কিন্তু ও পাটোয়ারী মানুষের সঙ্গে পারবে কে? চৌধুরী সেরেস্তায় চিরকাল পরের ফাঁকি দিয়ে এসেছেন, এবার নিজের ভাইদের ধরেছেন।

জয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা নয়। তা হলে না হয় বুঝতাম। ওঁদের রীতি আর এক রকমের। বলিয়া সে সজল চক্ষে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর বলিল, সে ত সরল মানুষের সোজা কাজ হ'ত, মেজদি। বুঝতাম যে, পৈতৃক ত্রিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর থেকে একটা মানুষ নিজে খেটে এই সব করেছে—তার জিনিষ এখন সে ফিরে নিচ্ছে। কিন্তু এ কি অন্যায়? মায়ের শ্রাদ্ধের দেনার টাকা। মা কেবল একলা তাঁরই ছিল এই কথাই কি বড়-ঠাকুর ভেবে রেখেছেন?

১৯

মাথায় চাদর বাঁধা, হাত তিনেক অন্তর পা ফেলিতে ফেলিতে রাখালচন্দ্র উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখ চোখ রৌদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, খুঁজে পেলাম না, বৌদি—

জয়া বলিল, তুমি বোসো ঠাকুরপো, ঠাণ্ডা হও। ছুটিয়া সে পাখা লইয়া আসিল।

রাখাল বলিল, বিভূতি দা, কলকাতায় নেই—

মৃদু হাসিয়া জয়া বলিল, তা জানি। তোমাকে কেবল অনর্থক কষ্ট দিলাম।

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, জানেন? তে যে বড্ড গোপন খবর কি করে জানলেন বলুন ত? তারপর যেন বড় এক সমস্যার সমাধান করিয়াছে এমনিভাবে বলিল, বিভূতি-দা চিঠি লিখেছিল, না?

না।

—তবে জানেন ছাই। আচ্ছা বলুন ত তিনি কোথায়?

জয়া হাসিয়া কহিল, বাড়ী।

অধিকতর বিস্ময়ে রাখাল বলিল, বাড়ী এসেছেন? কবে এলেন বাড়ী?

—কাল।

—তার আগে কোথায় ছিল বলতে পারেন?

জয়া বলিল, ঝামাপুকুরে কিংবা আফিসে।

রাখাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, আপনি কিচ্ছু জানেন না, বৌদি। শুক্রবার থেকে বিভূতি দা আফিসে যান না। ঐ যাঃ সব কথা বলে ফেললাম।

জয়া বলিল, দোষের কথা আর কি। ওঁর শরীর যা হয়েছে— কলকাতায় থাকলে আমি আফিসে যেতে দিতাম নাকি ?

রাখাল চিন্তিতের স্বরে বলিতে লাগিল, ও কথা নয়, সে আর এক কথা। ব্রাহ্মণ সন্তানের কাছে কথা দিয়ে এসেছি—আপনার বাপের বাড়ীর সরকার বিষ্ণুদাস বাবু। বলে ফেলে বুড়ো বেকুব রাস্তার মোড় অবধি এসে হাত ধরে ফেল্লেন, কাউকে প্রকাশ না করি।

জয়া বলিল, এখনো ত তা বল নি, তবে আর ভাবনা কি ?

প্রবল বেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে রাখাল বলিল, সে বলা যায় না। ব্রাহ্মণের গা ছুঁয়ে বলে এসেছি।

জয়া হাসিয়া বলিল, না-ই বা বললে ঠাকুরপো, কিন্তু শুধু মুখে যেন চলে যেও না। আমি আসছি, দাঁড়াও—।

কিন্তু রাখালের চলিয়া যাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এমন কি জয়ার এমন মনোরম প্রস্তাবেও আগ্রহ দেখাইল না। বলিল, যাবেন না, বৌদি। আচ্ছা, আপনাকে না হয় বলি কথাটা। কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না, বিভূতি-দাকেও না। বুঝলেন ত ?

জয়া বলিল, কাজ নেই ভাই, ব্রাহ্মণের কাছে সত্য করে এসেছ।

রাখাল দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আপনাকে বললে দোষ হবে না। আর কাজটা বিশেষ করে আপনারই। বড্ড আনন্দের খবর—আপনি জমিদার হয়ে যাচ্ছেন, সত্যি সত্যি জমিদার। কালেক্টরীতে খাজনা গুণতে হবে ঠিক চৌধুরী বাবুদের মতো—

জয়া অবাক হইয়া গেছে দেখিয়া রাখাল হাসিয়া বলিতে লাগিল— বুঝতে পারলেন না ? নিতাই চক্কোত্তির জমিদারী কেনা হল।

শুক্রবার সকালে নিতাইএর সঙ্গে বিভূতি-দা মহাল দেখতে বেরিয়ে ছিলেন। আজকে ত একুশে, আজকে সদরে বেজেষ্ট্রী হবার কথা। পুরুষ মানুষের নামে হলে ফ্যাসাদ অনেক, ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা ওঠে, তাই আপনার নামে করলা হচ্ছে। কিন্তু খরবদার, কথা প্রকাশ না হয়—আমি ব্রাহ্মণের কাছে দিব্যি করে এসেছি।

মুহূর্ত্তকাল জয়া অভিভূত হইয়া গেল, কথা বলিতে পারিল না। তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, এতক্ষণে তা হ'লে আমি জমিদার হয়ে গেছি। কি বল ঠাকুর-পো?

ফিস্ ফিস্ করিয়া রাখাল বলিল, আস্তে বৌদি, কথাটা জানাজানি না হয়। বিভূতিদা এত চুপি চুপি কাজ করছে, আপনার মা আর বিষ্ণুদাস বাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। আর জেনেছি আমি। ব্রাহ্মণ সন্তান আমায় অতি বড় দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন।

২০

বিভূতি অনেক রাত্রে ফিরিল। জয়া জাগিয়া বসিয়াছিল,—খাওয়া দাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করিল, ছেলে কেমন দেখলে?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বিভূতি তার পাঞ্জাবীর পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া একমুঠা বেলফুল বাহির করিয়া ফেলিয়া বিছানাময় ছড়াইয়া দিল।

জয়া বলিল, তারা বুঝি বেলফুল দিলে?

একটা ম্লান হাসি হাসিয়া বিভূতি বলিল, কেন আমি কি নিজে আনতে পারি না জয়া?

হঠাৎ অপ্রস্তুতে পড়িয়া গিয়া জয়া বলিল, তা পারবে না কেন?—আগে আগে ত প্রায় রোজই আনতে।

কেন কে জানে, নিজের অজ্ঞাতসারেই জয়া একটি চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জয়ার এই নীরব দীর্ঘ নিশ্বাসটি বিভূতির নজর এড়াইতে পারিল না। সে সহসা জয়াকে নিজের বক্ষের মধ্যে নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, আজ থেকে রোজ তোমার জন্যে বেলফুল আনবো জয়া।

জয়া কোন কথা বলিল না—নীরবে বিভূতির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিল।

নিবিড়কণ্ঠে বিভূতি ডাকিল, জয়া।

অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল, কেন? সে স্বর অশ্রুবিজড়িত।

বিভূতি কোন কথা বলিল না। এই নীরব স্নিগ্ধ শান্তিটুকুকে

সে আজ কথার কলরবে ভঙ্গ করিতে চায় না। জয়ার হাত ধরিয়া সে ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

মাথার শিয়রের জানালাটা খোলা ছিল। শুক্লপক্ষের স্বপ্নময় রাত্রি। দূরের গাছপালার উপর চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাটুকু নীরব শান্ত আশীর্ব্বাদের মত নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়াছে। কি প্রশান্ত নিরুদ্বেগ শান্তি। কোথাও যেন বাধা নাই—বিচ্ছেদ নাই—উদ্বেগ নাই—উৎকণ্ঠা নাই। সবই যেন পরিপূর্ণ, সহজ, সরল, অনাবিল।

গত রাত্রের মধুর স্মৃতির স্নিগ্ধ আমোদটুকু আজও বিভূতিকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রায় এক বৎসর হইল জয়ার কাছ হইতে সে যেন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল—আজ যেন সহসা কিসের আকর্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে।

শ্বশুরবাড়ীর পরামর্শে যেদিন হইতে সে মৈত্রসংসার হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই দিন হইতেই সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে জয়ার কাছ হইতেও সে নিজেকে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার পর হইতে জয়া কোনদিন তাহাকে মুখে কোন অনাদর দেখায় নাই বটে, কিন্তু যে নিবিড় স্নিগ্ধ ভালবাসাটুকু সে জয়ার কাছ হইতে বহুদিন হইতে পাইয়া আসিতেছিল—তাহা যেন গ্রীষ্মকালের পুকুরের মত হঠাৎ একদিন শুকাইয়া গেল।

প্রথম প্রথম বিভূতির নিকট এই পরিবর্ত্তনটা নিতান্ত বিসদৃশ ঠেকিলেও ক্রমে ইহা তাহার ধাতে সহিয়া গেল। ইহার পর হইতে সে জয়াকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। জয়াকে

ভাল লাগিত না বলিয়া নয়—তাহাকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত বলিয়া।

তাহার পর এমন একটা অবস্থায় আসিয়া সে পৌঁছিল যেখানে আসিয়া জয়া সম্বন্ধে তার মন এক প্রকার অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ কাল রাত্রে জয়ার মুখের পানে চাহিয়া সে চমকিয়া গেল।—সে মুখ যেন পৃথিবীর নয়। জানালার ভিতর দিয়া এক ঝলক্ ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না তাহার সেই পবিত্র সুন্দর মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এমন মহিমা সে কোনদিন কোন নারীর মুখে দেখে নাই।—সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের বিরাট বিস্তৃতির দিকে চাহিয়া তার সহসা যেন মনে হইতে লাগিল, সে যেন আজ তার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে।

তারপর জয়া যখন তাহাকে বাঁশ ঝাড়ের সমস্ত স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া আসিতে বলিল তখন সে যেন হাপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঠিক এমনই একটা কিছু সে যেন আজ করিতে চাহিতেছিল। এর চেয়ে অনেক বেশী ত্যাগ করিতে বলিলেও হয়ত সে আজ তাহাও করিয়া বসিত। বুকটা আজ যেন তার অনেক বড় হইয়া গিয়াছে।

তারপর সেই রাত্রেই বড়দাদাকে সে স্পষ্ট বলিয়া আসিল, বাঁশ-ঝাড়ের সমস্ত স্বত্ব সে ছাড়িয়া দিতে চায়। শিবরতন রাজী হইলেন না বটে—কিন্তু ফলাফলের প্রতি আজ বিভূতির দৃষ্টি নাই,—সে যে অনায়াসে অনেক কিছু ত্যাগ করিতে পারে,—ইহারই বিরাট শান্তিটুকু আজ যেন তাহাকে মস্‌গুল করিয়া রাখিয়াছে।

তারপর শয়নকক্ষে ফিরিয়া সে যখন জয়াকে বলিল,—বাঁশঝাড়ের সমস্ত স্বত্ব দাদাদের ছেড়ে দিয়ে এসেছি, জয়া। এবং জয়া যখন তার মুখের পানে মুগ্ধ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তখন বিভূতির সত্যই মনে হইয়াছিল পৃথিবীর মধ্যে তাহার মত ধনী আর দ্বিতীয় নাই। গোপনে জমিদারী কেনার গুপ্তবাসনা আজ যেন তাহার সেই বিরাট, উদার বক্ষের কোন্ এক অন্ধকারময় কোণে মাথা লুকাইতে গিয়াও দুঃসহ লজ্জায় বার বার সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

আজ সকাল হইতেই বিভূতির মনে হইতেছিল, গতরাত্রে যে সুখস্বপ্নটি সে দেখিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত যাহার মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে সে কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবে না। তার মনে হইতে লাগিল, এইখানেই যেন সে নিজেকে ঠিক খুঁজিয়া পাইয়াছে। এতদিন যাহাকে পাইবার জন্য সে চারিদিকে হাতড়াইয়া মরিতেছিল, আজ যেন ঠিক সেই জিনিষটিই আপনা হইতে তাহাকে ধরা দিয়া বসিয়াছে। পয়সা সে চায় নাই,—সে চাহিয়াছিল জয়াকে। আলাদা হইতে সে চায় নাই, আলাদা হওয়ার ভিতর দিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে সে জয়াকেই চাহিয়াছিল। কিন্তু আজ কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়াছে,—জয়াকে পাওয়ার পথ অত বক্র নয়—সে পথ সহজ ও সরল।

গতরাত্রের সুখস্মৃতির আমেজটুকুকে ফুলের গন্ধে স্বপ্নময় করিয়া তুলিবার জন্যই আজ রাত্রে গৃহে ফিরিবার সময় সে মল্লিকদের ফুলবাগান হইতে একরাশ বেল ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।

কিন্তু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ফুলগুলি বিছানায় ছড়াইয়া দিবার

সময় জয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, তারা বুঝি বেলফুল দিলে? তখন বিভূতির যেন কান্না পাইতে লাগিল। তবে কি সে ভুল করিয়াছে! তবে কি গতরাত্রের সুখস্বপ্নটুকু স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়?

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বিভূতি ডাকিল, জয়া!

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর আসিল কেন?

—তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

জয়া কোন কথা বলিল না—নীরবে বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

সহসা বিভূতি বলিয়া উঠিল, ওকি!—তুমি কাঁদছো না কি?

কোন উত্তর নাই।

জয়ার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বিভূতি বলিল, কি হয়েছে আমাকে বলবে না, জয়া?

সে স্বর অশ্রুসজল।

হঠাৎ নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া জয়া ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া বিভূতি বলিল, কি হয়েছে বল জয়া—লক্ষ্মীটি বল!

অতিকষ্টে কান্না চাপিয়া ধরা গলায় জয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না—আমি যে আর পারি না।

জয়ার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বিভূতি বলিল, তোমাকে কি কষ্ট দিয়েছি জয়া?

চাপা কান্নার স্বরে জয়া বলিল, তুমি আমার নামে জমিদারী

কিনছো শুনলাম ;—তোমার পায়ে পড়ি ওসব কোরো না ! কি হবে ওসব ছাইমাটি নিয়ে ?

ঘরখানা সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কেবল বাহির হইতে ঝিঁ ঝিঁ-পোকার বুকচেরা অশ্রান্ত গুঞ্জনধ্বনি করুণ হইয়া বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল ,—সে যেন কেবলই কান্না আর কান্না।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছিল কাহারও খেয়াল নাই—হঠাৎ এক-সময় বিভূতি বলিয়া উঠিল, বায়না পর্য্যন্ত হয়ে গেছে জয়া,—এখন আর ফেরাবার উপায় নেই,—জমিদারী কিনতেই হবে,—কিন্তু এক কাজ করলে হয়, বড়বৌদি, মেজবৌদি আর তোমার নামে যদি খরিদ করি ?—

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ পায়ের উপর কিসের কোমলস্পর্শে ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার পাদুটো জড়াইয়া ধরিয়া জয়া নীরবে পড়িয়া রহিয়াছে।

২১

পরদিন সকালে বড়বৌ ভাঁড়ারঘরে বসিয়া কুটনো কুটিতেছিল এবং পাশে বসিয়া গিবি শাক বাছিতেছিল এমন সময় হঠাৎ বাহির হইতে জয়া ডাকিল, গিবি।

গিবি কোন উত্তর দিলনা। কেবল ভয়ে ভয়ে তার মার মুখের পানে চাহিল।

বড়বৌ চাপা কণ্ঠে বলিল, খবরদার উঠবি নে। বল্ কাজ করছি, এখন যেতে পারবো না।

গিবি সে কথা বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

আবার ডাক আসিল, গিবি!

ভয়ে ভয়ে গিবি বলিল, ন-খুড়িমার যদি কোন দরকার থাকে?

চাপা ধমকের সুরে বড়বৌ বলিল, দরকার থাকে নিজে আসবে'খন।

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জয়া আসিয়া ঘরের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল, এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই বলিল, সাড়া দিচ্ছিস্ না যে বড়?

গিবি কোনো কথা বলিল না, কেবল করুণ নয়নে জয়ার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। সেই দিক পানে চাহিয়া জয়ার চক্ষে জল আসিল।

গিবির হইয়া বড়বৌ উত্তর দিল, কবে একবার অসুখের সময় সেবা করেছিলি বলে জন্মের শোধ ওর মাথা কিনে রেখেছিস না কি?

অত্যন্ত সহজ এবং অবিচলিত কণ্ঠে জয়া বলিল, রেখেছিই ত, তুমি যেমন পেটে ধ'রে ওর মাথা কিনে রেখেছ।

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বড়বৌ চেঁচাইয়া উঠিল, কি বল্লি!

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জয়া বলিল, পেটেই না হয় ধরি নি, তাই বলে কি ওর ওপর আমার কোনো জোর নেই দিদি!—মা-খুড়ী ভিন্ন না কি?—কথাটা শেষ করিয়াই জয়া ডাকিল, আয় গিরি।

গিরি ভয়ে ভয়ে তার মার মুখের পানে চাহিল।

বড়বৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, খবরদার উঠ্‌বি নে হতচ্ছাড়ী।

হাসিতে হাসিতে জয়া বলিল, আমি যদি জোর ক'রে ওকে নিয়ে যাই কি করবে দিদি?

বড়বৌ চিটকাইয়া উঠিল, কি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবি? কৈ যা দেখি একবার।

একগাল হাসিয়া জয়া বলিল, পুলিসে দেবে না কি?

—দোবোই তো। বলিয়া বড়বৌ এমন একটা অপূর্ব্ব মুখভঙ্গি করিল যাহা দেখিয়া জয়া আর থাকিতে পারিল না, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জয়ার এই প্রাণখোলা হাসিতে বড়বৌ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বলিল, কি!—আমাকে টিট্‌কিরি দেওয়া!

জয়া তেমনই সহজ কণ্ঠে বলিল, তুমি আর হাসিও না দিদি!

বড়বৌ আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, আমার কথায় তোর হাসি

পায়—এতদূর অবজ্ঞা! বড় বাড় বেড়েছিস্! মাথার ওপর ভগবান আছেন তা জানিস্?

মেজ-বৌ রকে বসিয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছিল, বলিয়া উঠিল, চলে আয় ন-বৌ। ভগবান শুধু আমাদের মাথার ওপরই নেই, ওঁর মাথার ওপরও আছেন!

জয়া তেমনিই হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, তুমিও আর হাসিও না মেজদিদি।

মেজবৌ এ অপমান সহ্য করিতে পারিল না, ছুটিতে ছুটিতে ভাঁড়ার ঘরের নিকট আসিয়া দুই কোমরে দুই হাত দিয়া মাথা দোলাইয়া বলিতে লাগিল, তোর যে বড় অহঙ্কার হয়েছে দেখছি! আমাদের কথা শুনে তোর হাসি পায়, নয়? তবু যদি না বিয়ে দিয়ে আনতাম! আঁটকুড়ীদের ধরণই এই! অনেক পাপ না করলে ভগবান আঁটকুড়ী করে রাখেন?

অন্যদিন হইলে জয়া ক্ষেপিয়া যাইত। আর সবই সে সহ্য করিতে পারিত, কেবল মাতৃত্বের এই দারুণ অবমাননা সে কোন দিনই সহ্য করিতে পারিত না। কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক এই কটূক্তিই তাহাকে এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, দেবতুল্য বড় ভাসুরের প্রতিও সে সুবিচার করিতে পারে নাই। আজ কিন্তু সে এতটুকুও বিচলিত হইল না। আজ যেন সে পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতে পারে। গত রজনীর গভীর অন্ধকারের মধ্যে যে বিরাট উদাত্ত সুরটি সে তার চিত্তবীণার তারে তারে বাঁধিয়া লইয়াছে—তাহা এই সকল তুচ্ছ ছোটোখাটো গৃহ-কলহের বহু ঊর্দ্ধে।

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে জয়া বলিল, আঁটকুড়ী বল্লেই আঁটকুড়ী হয়ে গেলাম আর কি!—আমার গিরি বেঁচে থাক্, আমার রাম-লক্ষ্মণ বেঁচে থাক্, ছেলে-মেয়ের আমার অভাব কি, মেজদিদি!

মেজবৌ একথার কোন উত্তর দিল না। চলিয়া যাইতে যাইতে সে আপন মনে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া গেল, আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে!

জয়া কোন কথাই বলিল না, চৌকাঠের উপর যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

বড়বৌ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোর মৎলবটা কি খুলে বলতো!

জয়া হাসিয়া উত্তর দিল, তোমাদের সব জব্দ করবো বলে ঠিক করেছি।

মুখখানি বিকৃত করিয়া বড়বৌ বলিল, সে ত অনেক দিন থেকেই করছ।

জয়া হাসিয়া উত্তর দিল, এবার আরো বেশি করে করব মনে করেছি।

বড়বৌ আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল, একরত্তি মেয়ে, এই সেদিন বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম—আজ বলে কিনা জব্দ করবো! সাধে বলে কলিকাল!

তেমনি হাসিমুখে জয়া বলিল, তুমিও কি ফেলতে পারবে মনে করেছ দিদি! গিরি যদি কাল অবাধ্য হয় তাকেও কি ফেলতে পারবে?

কথাটা শেষ করিয়াই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে গিরিকে

একরকম জোর করিয়াই টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল, আমার মেয়ে আমি নিয়ে যাবো—বেশ করবো —খুব করবো।

২২

সকালবেলাকার আহ্নিক সারিয়া শিবব্রতন উঠিতেছিলেন, হঠাৎ গিরি আসিয়া বলিল, ন-খুড়ীমা আপনাকে কি বলবেন বলে দাঁড়িয়ে আছেন।

হতভম্বের মতো শিবব্রতন একবার দ্বারের দিকে চাহিলেন, তাহার পর সহসা নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া বলিলেন, কে? ন'বৌমা?—কি বলতে চাও, বল মা।

জয়া দরজার আড়াল হইতেই বলিল, গিরি, তুই জিজ্ঞেস কর, আমাদের সম্বন্ধে উনি কি ব্যবস্থা করলেন।

গিরিকে কিছুই বলিতে হইল না—কেন না তাহাকে উপলক্ষ করিয়া জয়া নিজেই তার ভাসুরের সাথে কথা কহিতেছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শিবব্রতন বলিলেন তোমাদের বন্দোবস্ত ত কালই করে দিয়েছি মা। বিষয় সমান বখরা হয়েছে।—তার পরই হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা, বাঁশ-ঝাড়ের সমস্ত স্বত্ব বিভূতি ছেড়ে দিতে চায়। বেশ, তার জন্যে সে মূল্য ধরে নিক, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বিনামূল্যে সে ছেড়ে দেবে—তা কিছুতেই হয় না মা।

আড়াল হইতে জয়া বলিল, গিবি তুই বল্, স্বত্ব কারুর থাকলে ত ছাড়বে। এ সংসারের যা কিছু সবই ত আপনার। স্বত্ব ছাড়াছাড়ির কথা ওঠে কি কবে? আপনি যতদিন নিজে হ'তে না তাড়িয়ে দেন ততদিন কার সাধ্যি এখান থেকে এক পা নড়ে।"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ শম্ভুবতনের কণ্ঠস্বরে থামিয়া গেল।

শম্ভু এতক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া লুকাইয়া সকল কথা শুনিতেছিল, হঠাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চেঁচামেঁচি করিতে সুরু করিয়া দিল, ন'বৌমা ঠিকই ত বলেছেন। আপনি যদি পৃথক করে না দেন তো কার সাধ্যি আলাদা হয়। যে আপনার কথা না শুনবে তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। থাকুক সেখানে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে। আর বিভূতির কথা বলছেন? তাকে কান মোলে ধমকে দেবেন—সেদিনের এক কোঁটা ছেলে বৈত নয়। আমরা এখান থেকে এক-পা নড়ছি না—দেখি আমাদের কে তাড়িয়ে দেয়। হুঁ। তাড়িয়ে দিলেই হোলো কি না। কোনোদিন কিছু বলি না তাই। কেন কি অপরাধ করেছি আমরা?

শিবরতন হতভম্বের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

২৩

তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে শিবরতন কহিলেন, অপরাধ তোমাদের কিছু নয় শম্ভুরতন, অপরাধ বোধ করি আমাদের অদৃষ্টের।

তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমায় এমন একটী সকরুণ গাম্ভীর্য্য থম থম করিতেছিল যে শম্ভুরতনের আবদারের বাচালতা এক মুহূর্ত্তে মূক হইয়া গেল। সরল মানুষটী একান্ত অসহায় ভাবে বড় বড় চোখ দুইটী মেলিয়া শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

শিবরতন শান্তকণ্ঠে বলিলেন, অদৃষ্টেরই বা অপরাধ কেন দিই শম্ভু, এই হয় তো ভবিতব্য। আমি এ ক'দিন অনেক ভেবে দেখেছি। তুমিও ভেবে দেখ—আজ আট পুরুষে মৈত্রবংশের এই বিরাজপুরে বাস। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় অষ্টম পুরুষ আজ আমরা মাত্র তিন ভাই। যদি আদিপুরুষ থেকে প্রত্যেকের দুটী করে সন্তানও হ'ত তবে আজ একশ ভাইএরও অধিক এই মৈত্রবংশের অধিকারী হতাম। কিন্তু তা হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একসন্তানই আমাদের হয়ে এসেছে। তৃতীয় পুরুষ মহেশ্বর মৈত্রের তিন সন্তান হয়েছিল। কিন্তু তাঁর একজন নিঃসন্তান—একজনের ছিল কন্যা—আমাদের চতুর্থ পুরুষ আবার এক সন্তান। দৌহিত্র বংশে সম্পত্তি যায় নি। ফলে সেই একসন্তানই থেকে গেল। আজ আবার তাঁরই ইচ্ছায় আমরা তিন ভাই। তাঁরই ইচ্ছাতে আমাদের পৃথক হতে হবে। আমার মনে · ·· ···

শিবরতনের বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু কণ্ঠস্বর জড়িত হইয়া আসিতেছিল। তিনি চুপ করিয়া আত্মসংবরণের চেষ্টা

করিলেন। তারপর অকস্মাৎ গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা, তারা!

তিনি ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়া জয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ভাসুরকে সে চিনিত। তাঁহার শান্ত মৃদু কণ্ঠস্বরের মধ্যে সে যেন শুনিল অলঙ্ঘনীয় বিধিলিপির প্রতিধ্বনি। সেও ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া আপন ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

হতভম্বের মত তক্তপোষের উপর বসিয়া রহিল শুধু শম্ভু। কিছুক্ষণ পরে সে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, তাঁর ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছা না আমার মাথা! খুলে বল্লেই হয় যে আমার ইচ্ছা। নইলে ঐ বিভূতিটা, ও বাঁদরকে আমি তিন চড়ে সোজা করে দিতে পারি।—কিন্তু সেও হতে দেবেন না—বলবেন, তাঁর ইচ্ছা!

নিরুপায়ে একান্ত অস্থির চিত্তে শম্ভুরতন তার প্রকাণ্ড গোঁফ জোড়াটা পাক দেওয়ার নামে টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল।

শম্ভুরতনের বড় ছেলে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। শম্ভু অকারণে তাহারই উপর চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল, কি?

বাপের মোটা মোটা চোখ ছেলের বড় ভয় ছিল। সে সভয়ে বলিল, মাইনে।

—মাইনে? কিসের মাইনে?

—ইস্কুলের মাইনে।

শম্ভু জ্বলিয়া উঠিল। সে কখনও ছেলের মাহিনা জোগায় নাই। হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিল, সে আমার কাছে কি? বলি সে আমার কাছে

কি রে শূয়ার ? ছেলের গলা শুকাইয়া আসিতেছিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, মা যে বল্লে আমরা ভেন্ন হয়েছি—

—ভেন্ন !—শম্ভু সরোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।—ভেন্ন হয়েছি ত' তোর কি ? তুই বলবার কে ? তক্তপোষের উপর প্রচণ্ড একটা কিল বসাইয়া শম্ভু মাটীর উপর সজোরে পদাঘাত করিল। ছেলের মা বোধ করি অন্তরালেই কোথাও ছিলেন। আগ্নেয় গিরির মতো উত্তপ্ত স্বামীর সম্মুখে শান্ত কঠিন ভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—উত্তর মেরুর হিম কঠিন তুষার স্তূপের মত।—বলি ওর অপরাধটা কি শুনি ?

শম্ভু ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ক্রোধ-রক্ত চক্ষে মেজ-বৌর মুখের দিকে হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া মেজ-বৌ আবার বলিল, মা গো, এমন আদিখ্যেতা তো কোন জন্মে দেখিনি। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—এ ত' সেই মান্ধাতা পুরুষের আমল থেকে হয়ে আসছে। আর ঠাঁই ঠাঁই হতে যাচ্ছ নিজেরা শুনলেই ত গুণের দাদার মুখে

শম্ভুরতন বারুদ স্তূপের মত ফাটিয়া পড়িল, খবরদার !

ক্রোধে আত্মহারা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য শম্ভুর চীৎকারে সমস্ত বাড়ী খানাই যেন চমকিয়া উঠিল। ছেলেটা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মেজ বৌ পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া নীরব হইয়া গেল। ওঘর হইতে বড়বৌ বাহিরে আসিয়াছিল কিন্তু তাহারও আগাইয়া আসিবার সাহস হইল না। গিরি কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু কাকার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সেও থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। শম্ভু তখনও বলিতেছিল, পাজী ছোটলোক স্ত্রীলোক কোথাকার—

—শম্ভু।' শিবরতনের কণ্ঠস্বর।

শম্ভুর চীৎকার শুনিয়া শিবরতন পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিয়াছিলেন। অগস্ত্যের আগমনে ক্রোধ-স্ফীত-কলেবর বিন্ধ্যগিরি এক মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত নতশির হইয়া পড়িল। শম্ভুরতন মাথা হেঁট করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

শিবরতন বলিলেন, শম্ভু, বৌমারা হলেন সম্মানের পাত্রী। দোষ করলে শাসন করতে পার কিন্তু অপমান কি অসম্মান আর কখনও যেন না হয়।

শম্ভু নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শিবরতন প্রশ্ন করিলেন গিরিকে,—কি হয়েছে রে গিরি?

ঘরে বসিয়া গিরি সব দেখিয়াছিল। সে সমস্ত জ্ঞাপন করিলে শিবরতন ভাইপোকে সস্নেহে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এখুনি মাইনে চাই বাবা? না, ইস্কুল যাবার সময় নেবে?

জ্যাঠা মহাশয়ের একান্ত কোলের কাছে দাঁড়াইয়া রাম মৃদুস্বরে বলিল, যখন দেবেন আপনি।

হাসিয়া শিবরতন বলিলেন, মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখুনি পেলেই খুসী হও। এস আমার সঙ্গে।

রামের হাত ধরিয়া শিবরতন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বর্ষার বর্ষণ ও গর্জ্জনস্তব্ধ মেঘাবৃত দিনের ম্লানিকর গুমোটের মত একটা অবাঞ্ছনায় নিস্তব্ধতায় সমস্ত বাড়ীটা যেন থম থম করিতে লাগিল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া শম্ভু স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। মনের মধ্যে রুদ্ধ ক্রোধ ও দুঃখের আর পরিসীমা ছিল না। অকস্মাৎ

ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গভীর-আক্ষেপ-জীর্ণ স্বরে ঊর্দ্ধমুখে সে বলিয়া উঠিল, যে আমাদের সুখের সংসার ভাঙলে, হে ভগবান, তার যেন সর্ব্বনাশ হয়।

বলিয়াই সে হন্ হন্ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

মেজ-বৌ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল যেন পাথরের প্রতিমা। এত বড় নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল, উঃ বাবা গো!

রান্নাঘরের মধ্যে বড়বৌও নিমেষের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর সে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া সক্রোধে ডাকিল, মেজ ঠাকুরপো!

শম্ভু তখন বাহিরে চলিয়া গেছে। এদিকে বিভূতি ত্রস্ত কণ্ঠস্বরে ডাকিয়া উঠিল, জল—জল। ন' বৌ-এর ফিট্ হয়েছে— বড় বৌ দি, বড় বৌ দি!

২৪

রাত্রির মোহ বিভূতির রাত্রির সঙ্গেই কাটিয়া গিয়াছিল। সকাল হইতেই সে কেবলই ভাবিতেছিল, জয়াকে কেমন করিয়া মতানুবর্ত্তিনী করা যায়। তারপর অকস্মাৎ প্রভাতের এই ঘটনা।

মূর্চ্ছান্তে চেতনা পাইয়া জয়া কাতর স্বরে মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিল, ওগো আমাকে কলকাতায় নিয়ে চল গো—এ অশান্তির মধ্যে আর আমি থাকতে পারছি না।

বিভূতি মনে মনে খুসী হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, অপেক্ষা কর আমি আসছি।

আলনা হইতে জামাটা টানিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। জয়া সেই মঞ্চের উপর পড়িয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ আবার ফোঁপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শম্ভুরতনের সেই মর্ম্মান্তিক-আক্ষেপ-দীর্ণ স্বর তখনও তাহার কানের পাশেই বাজিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এ অভিসম্পাত তাহারই—একমাত্র তাহারই প্রাপ্য।

মনে মনে বার বার বিচার করিয়াও একমাত্র বিভূতি ছাড়া সে অপর কাহাকেও এ জন্য দায়ী করিতে পারিল না। কিন্তু সে নিজে,—নিজে সে তো কোন দোষ ক'রে নাই। তবে এ দণ্ড তাহার উপর কেন? কোন অপরাধে? কই, একবারও ত কেহ তাহার কথা ভাবিয়া দেখিল না! এ সংসারের জন্য সে না করিয়াছে কি? জুতা পর্য্যন্ত মাথায় বহিতেও সে দ্বিধা করে নাই। অথচ আজ অপর দুই ভাই-এর স্বার্থে আঘাত দেওয়ার জন্য এক মুহূর্ত্তে বিনা দ্বিধায় এত বড় একটা অভিসম্পাত বিভূতিকে উপলক্ষ করিয়া তাহারই মাথায় নিক্ষেপ

করিল। একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে এ অভিশাপতো বিভূতিকে দেওয়া হইল না, দেওয়া হইল জয়াকে। এ অভিশাপের অর্থ তাহার জীবনের একমাত্র কাম্যধন হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হওয়া। এ জীবনে কেহ তাহাকে মা বলিয়া ডাকিবে না। যে সন্তানগুলি বিধাতার সৃষ্টিশালা হইতে অদৃশ্যপথে তাহাকে মা বলিয়া হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল তাহাদের পথে এপার ওপারের মধ্যে যে সেতু বন্ধ—সে সেতু এই অভিশাপ একমুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া দিল। দুঃখ বেদনা ধীরে ধীরে ঘৃণায় ক্রোধে রূপান্তরিত হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ইহার প্রতিশোধ লইতে এই সংসারটাকে সে বাঘিনীর মত নখে করিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেয়।

অপর দিকে আরও দুইটী নারী তখন ঠিক এমনি ভাবেই মর্ম্মদাহে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। মেজ বৌ পাথরের প্রতিমার মত নিশ্চল ভাবে মাটীতে পড়িয়া ভাবিতেছিল, বিষ খাইয়া সে মরিবে। সে বুঝিয়াছিল, এ অভিসম্পাত দেওয়া হইয়াছে তাহাকেই। এই সংসারটার অতীত ইতিহাসের মধ্যে তাহার নিজের অপরাধ আজ যেন পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইল। সে পাহাড়ের আড়ালে অপর সকলের অপরাধ যেন ঢাকা পড়িয়া গেছে।

বড় বৌ মনে করিল, এ অভিসম্পাত দেওয়া হইল তাহাকে। তাহার মনের খতিয়ানে পৃথক্ হওয়ার ইচ্ছার পরিমাণ কারও চেয়ে তো কম দাঁড়ায় না। বরং সকলের চেয়ে বেশী বলিয়াই মনে হইল। সে নিন্দা করিতেছিল শুধু ভাগ্যের। এমন স্বামীর হাতে পড়িয়াছে যে জীবনে কখনও তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিল না। এবং এ লাঞ্ছনা

সেই কারণেই একান্ত ভাবে তাহারই প্রাপ্য। তাহার মনে হইল, সে ছাড়া অপর কাহাকেও এত বড় অভিসম্পাত দিতে কেহ কখনও সাহস করিত না।

বিভূতিরতন গিয়াছিল নিতাই চক্রবর্ত্তীর ওখানে। তাহার অভিপ্রায় ছিল জয়াকে কোনো মতে কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়া কবলা সম্পাদন করিয়া লইবে। তাই জয়া যখন নিজ হইতেই কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিল তখন সে সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তীর নিকট দুইটা দিন সময় বাড়াইয়া লইবার ব্যবস্থা করিল।

ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তা' হলে সেই ব্যবস্থাই—

কিন্তু কথা সে শেষ করিতে পারিল না। জয়া জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। বিভূতির সাড়া পাইয়া সে মুখ ফিরাইতেই তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বিভূতি স্তম্ভিত হইয়া গেল। বড় বড় কোমল চোখ দুইটী ইস্পাতের ছুরির মত ধারালো হইয়া উঠিয়াছে। শুধু চোখ কেন জয়ার সর্ব্ব অবয়বের রূপের মধ্যেই যেন একটা সুপরিস্ফুট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেছে। বিভূতি ভয় পাইয়া গেল। জয়ার এ নবরূপ, জয়ার এমন মূর্ত্তি সে কখনও দেখে নাই। বিভূতি কি বলিতেছিল তাহা শুনিবার জন্য জয়া এক বিন্দু আগ্রহ প্রকাশ করিল না, এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল না। সে নিজেই বলিল, চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি কেনার কি হল?

গতরাত্রের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া বিভূতি শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে একটা সুসঙ্গত উত্তর খুঁজিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বলিয়াই গেল,—

—আজ তোমার কাছে আমি মাফ চাচ্ছি। সম্পত্তি কিনতে বাধা

দিয়ে, পৃথক হতে বাধা দিয়ে আমি অন্যায় করেছি। তারই জন্যে মাফ চাচ্ছি।

বিভূতির শঙ্কা বাড়িয়া গেল। তাহার এই অভিমানিনী পত্নীটীর বাঁকা কথা অনেক সময় সে ভাল বুঝিতে পারে না। কিন্তু উত্তর একটা না দিলেও নয়। বেচারা বিভূতি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, সে তুমি যেমন বলবে তেমনি হবে, না হয় তিন বৌ-এর নামে—

বাধা দিয়া দৃঢ় কণ্ঠে জয়া বলিল, না। শুধু আমার নামে কেনা হবে। আর চক্রবর্ত্তী ওর পাকা বাড়ীটীও বিক্রী করবে শুনছিলাম না? সেটারও দাম দর করে ফেল। সেও কিনতে হবে।

বিভূতি জয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়া বলিল, আজই—আজই আমি এ বাড়ী ছেড়ে যাব। এ বাড়ীতে আমি আর জল গ্রহণ করব না।

এইখানেই বিভূতির ভয়। এতটা সাহস তাহার নাই। দাদার চোখের উপর ভিটা ভাগ কিংবা ভিটা ত্যাগ এ দুইটী মনে আনিতেও তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে। শুধু কাঁপিয়া উঠেই নয়, বুকে বোধ হয় বেদনা-বোধও হয়। বলিল, সে যাক জয়া, জান ত' দাদা—

জয়া অনুত্তেজিত দৃঢ়ভাবে বলিল, আমাকেও তো তুমি জান। আমি ত বলেছি এ বাড়ীতে আমি জল স্পর্শ করব না। এখন তোমার যা খুসী কর।

বিভূতি নত মস্তকে বোধ করি ভাবিতেছিল দাদার মুখ।

জয়া বলিল, তোমার সহোদর, তাদের অভিশাপ তুমি মাথায় ক'রে নিতে পার, তার বদলে তুমি তাদের মার্জ্জনা করতে পার, কিন্তু আমি

মার্জ্জনা করব কেন? কিসের জন্য?

বিভূতি বলিল, তুমি উত্তেজিত হয়েছ জয়া—। নইলে অভিসম্পাতের কথা তুচ্ছ বলে তুমি উড়িয়ে দিতে।

জয়া এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু ঝর ঝর করিয়া চোখের জল তাহার বুক ভাসাইয়া দিল। জয়ার মনের ব্যথা বিভূতি জানে না। তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সে স্পষ্ট দেখিতেছিল, অদৃশ্য পথে যে চাঁদের মত শিশু হামা দিয়া তাহারই কোলের দিকে আসিতেছিল অকস্মাৎ এক নিদারুণ আঘাতে ঝরা ফুলের মত সে পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

বিভূতি জয়ার হাত দুইটী ধরিয়া পরম স্নেহকোমল স্বরে বলিল, কেঁদনা জয়া, কেঁদনা ছিঃ।

জয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া মুখ লুকাইল। বুকে সে একটা কঠিন বস্তুর আঘাত অনুভব করিতেই তাহার মনে হইল বস্তুটা কি। বস্তুটা একটা কবচ। সন্তান কামনা করিয়া এবার ঐটি ধারণ করিয়াছিল। জয়া বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার মত উঠিয়া বসিল। তারপর সজোরে টান মারিয়া পট্ করিয়া কবচটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ক্ষিপ্তার মত বলিয়া উঠিল, আমাকে নির্ব্বংশ করার জন্য এই অভিশাপ সে আমি জানি। কিন্তু যে পাপের জন্যে আমার এই দণ্ড সে পাপ আধখানা করে ক্ষান্ত হব কেন? ঐ সংসার টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাক। বল তুমি,—আমাকে ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বল নিতাই চক্রবর্ত্তীর বাড়ী কিনবে—আজই কিনবে?

বিভূতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিনব।

২৫

সেদিন আর মৈত্র বাড়ীতে কাহারও আহার হইল না। যাহা কিছু রান্না হইয়াছিল সব শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। যাহা উনানে চড়ানো ছিল তাহা পুড়িয়া গেল। শম্ভুরতন না খাইয়া আদালতে চলিয়া গেছে। বড়গিন্নী আপনার ঘরে শুইয়া আছে। মেজবৌর ছোট ছেলেটী মাকে বিরক্ত করিতে করিতে অবসন্ন ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বড় ছেলেটীকে গিরি বুড়ীদের বাড়ীতে খাওয়াইয়া ইস্কুলে পাঠাইয়া দিয়াছিল। নিজে সে মায়ের পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে জয়ার ঐ অবস্থা। বিভূতির ভাত চাহিতে সাহস হয় নাই। সেও বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, এ কি হইতে কি হইল। শিবরতন ভ্রাতষ্পুত্রকে স্কুলের বেতন দিয়াই বাহিরে গিয়াছিলেন। যখন তিনি ফিরিলেন তখন পরিপূর্ণ দ্বিপ্রহর—সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া তিনি ভ্রুকুটী করিয়া ডাকিলেন, গিরি!

কেহ কোন উত্তর দিল না। শিবরতন কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্চ করিয়া আবার ডাকিলেন, বড়বৌ!

বড়বৌ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া সজল চক্ষে মৃদুস্বরে বলিল, কখনও কিছু চাই নি তোমার কাছে। আজ ভিক্ষা চাইছি, আমায় কিছু দিনের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে জীবন্ত পুড়তে আর আমি পারছি না।

শিবরতন প্রশ্ন করিলেন, হ'ল কি?

বড়বৌ উত্তর দিতে পারিল না, হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। গিরি উঠিয়া আসিয়াছিল। সে সমস্ত বলিয়া বলিল, ন'খুড়ীমা তাঁর ঘরে প'ড়ে আছেন, ও ঘরে পড়ে আছেন মেজ খুড়ীমা, এ ঘরে মা। সবাই বলেন, শাপ দেওয়া হ'ল আমাকে।

শিবব্রতন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিল, তারা, তারা!

তারপর বলিলেন. গিরি, আমার স্নানের ব্যবস্থা ক'রে দাও তো মা। বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় শিবব্রতন ভাইদের ডাকিলেন। শম্ভু একটা থামের আড়াল দিয়া বসিয়াছিল। বিভূতি নতমুখে অকারণে সতরঞ্চির কোণটা টানিতেছিল। তিনজনেই নীরব। শম্ভুই প্রথমে কথা কহিল, থামের আড়াল হইতেই বলিল, শাপ দিলাম বলেই যদি শাপ দেওয়া হয় তা' হলে আর বাকী থাকত না।

শিবব্রতন বলিলেন, কিন্তু রূঢ় কথায় আঘাত যে পায় সবাই।

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল।

শিবব্রতন আবার বলিলেন, এত বয়স হ'ল তোমার, কিন্তু রাগ দমন করতে শিখলে না? ক্রোধ হ'ল চণ্ডাল, মানুষকে চণ্ডালে পরিণত করে।

শম্ভু মৃদুস্বরে বলিল, আমি ত' মেজবৌকে—

ভৎ'সনা করিয়া শিবব্রতন বলিলেন, ছি! তাঁর অপরাধই বা কি বল?

বিভূতি মৃদুস্বরে বলিল, ন-বৌ ত সমস্ত দিন জল গ্রহণ করে নাই। সে ধরেছে—

শিবরতন বলিলেন, থামলে কেন—বল।

শম্ভু বলিয়া উঠিল, বলাবলিতে আর কাজ কি বাপু, চল আমি বড়বৌর পায়ে ধ'রে মাপ চাচ্ছি। আর ওদের আশীর্ব্বাদ করছি যে তোমাদের ছেলেরা সব দীর্ঘজীবী হোক।

শিবরতন বলিলেন, গিরির কাছে আমি সব শুনেছি বিভূতি। তবে আমার অনুরোধ ছিল কি জান? তুমি এই মৈত্র বাড়ীর ভিটার ওপরেই পাকা বাড়ী তোল। স্থানের ত' অভাব নাই। ন' বৌমাকে ব'ল এ আমার মিনতি তাঁর কাছে। আর—

গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার তিনি বলিলেন, আমি কাশী যেতে চাই ভাই। তোমরা দেখে শুনে গিরির একটী পাত্র খুঁজে দাও। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বনাথের দরবারে গিয়ে আশ্রয় নি।

শম্ভু বলিয়া উঠিল, গিরির বিয়ে পর্য্যন্ত তা' হলে ভেন্ন হওয়া হ'তে পারে না।

—কেন?

এ কেনর উত্তর শম্ভু খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে বলিল, অনেক খরচ পত্র ক'রে গিরির বিয়ে দিতে হবে।

শিবরতন হাসিয়া বলিলেন, আমার সাধ্য যে অতি সামান্য শম্ভু। আমার অংশের সম্পত্তির প্রথমাংশ রাখতে হবে দেব-সেবার জন্যে। তারপর গিরির বিবাহ। অবশিষ্টও কিছু রাখতে হবে আমার আর বড়বৌ-এর ভরণ-পোষণের জন্যে।

বিভূতি চোরের মত উঠিয়া পড়িয়াছিল। শিবরতন বলিলেন, উঠছ তুমি? দাঁড়াও একটু। ন'বৌমার বাকী টাকাটার যোগাড়

করেছি। সেটা নিয়ে যাও। আর কালই তা' হলে ভিটেটা মাপ ক'রে তিন অংশ ক'রে ফেলা হবে।

গিরি আসিয়া বলিল, সন্ধ্যের জায়গা করেছি বাবা।

শিবরতন বলিলেন, চল যাই।

সন্ধ্যাকৃত্য শেষ করিয়া উঠিয়া শিবরতন দেখিলেন, বিভূতি অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আর কিছু বলবে বিভূতি?

—হ্যাঁ। ন-বৌ বলছিল যে শিশিরের সঙ্গে যদি গিরির বিবাহ দেন—ওর ভাবী ইচ্ছে।

শিবরতন বলিলেন, গিরি কি ভাই আমার একার? সে ত' তোমাদেরই। তবে আমার মত যদি জিগ্যেস কর, শিশিরের মত পাত্রে বিবাহ দেওয়া যে আমার সামর্থ্যেরও অতীত। তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে কি আমি পারব?

ভিতরের কড়াটা বাজিয়া উঠিল। বিভূতি ঘরের মধ্যে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বলছে, আপনার আশীর্ব্বাদই হবে শিশিরের শ্রেষ্ঠ বর-মর্য্যাদা।

শিবরতন বলিলেন, কিন্তু আমার জন্যে উনি যেন কারও কাছে মাথা হেঁট না করেন। কোনো প্রার্থনা বা আবদার যেন সেখানে না জানান। সে হবে আমারই মর্য্যাদা-হানি। এই প্রতিশ্রুতি আমি ওঁর কাছ থেকে নিচ্ছি। আর ব্যবস্থাটা শীগ্‌গির করে ফেলতে হবে। আমি কাশী যেতে চাই।

চলিয়া যাইতে যাইতে আবার তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

কাল সকালে তা' হলে কোথাও যেয়ো না যেন। ভিটেটা তিন অংশ ক'রে ফেলা হবে।

বিভূতি নতমুখে বলিল, গিরির বিয়ে পর্য্যন্ত—

—না ভাই, অশান্তি আর আগুন এদু'টোকে কখনও চাপা দিতে চেয়ো না। পরিণামে একদিন সে দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠবে।

২৬

শিবব্রতনের ইচ্ছায় বাদ সাধিল ন-বৌ জয়া—

পরের দিন ভোরে উঠিয়া জয়া নিজের কাপড় বদলাইয়া ভাসুরের সন্ধ্যাহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিতে গেল। গিরিবালারও ভোরেই ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল এবং পিতার সন্ধ্যাহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিতে আসিয়া ন-খুড়ীমার হাতে কোশাকুশী দেখিয়া নিশ্চুপ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়া গিরিবালার আগমন টের পাইয়া হাসি চাপিতে গিয়া একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, যাও, এখানে আর দাঁড়িয়ে দেখতে হবে না। এ সামান্য কাজ আমি একলাই ক'রে উঠতে পারব।

গিরিবালা তাহার কথায় কেমন জানি একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু বিব্রত হইয়া পড়া সত্ত্বেও সে ন-খুড়ীমার মুখে বহুদিন পরে আবার যেন অকারণ উল্লাসের একটি অস্পষ্ট পরিচয় পাইল। গিরিবালা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। জয়া ডাকিল, ও গিরি, শোন্।

গিরিবালা আবার ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে জয়ার সম্মুখে দাঁড়াইল।

জয়া বলিল, বঠ্‌ঠাকুরকে গিয়ে বল্ যে, তাঁর সন্ধ্যাহ্নিকের জায়গা হয়েছে।

গিরিবালা চলিয়া যাইতেছিল।

জয়া তাহাকে আবার ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল, বাবা! বাবা! কি মেয়ে তুই গিরি! মুখে তোর কথা নেই কেন শুনি?

গিরিবালা নীরব হইয়াই রহিল।

জয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, ও, বুঝেছি! যা, যা, আমার সাম্‌নে থেকে সরে যা বল্‌ছি।

গিরিবালা এতক্ষণে কথা কহিল এবং অভিমানে কথা তাহার ভারী হইয়া উঠিল। বলিল, আমিতো সরেই যাচ্ছিলাম, তুমিই না ডেকে ফেরালে!

হু, ফিরিয়েছিতো! —বলিয়া জয়া একটা শব্দ করিয়া কোশাকুশী মেঝেয় রাখিয়া আবার বলিল, এখন দয়া ক'রে বঠ্‌ঠাকুরকে সন্ধ্যাহ্নিক সারতে পাঠিয়ে দাওগে।

গিরিবালা মুহূর্ত্তে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অল্পপরেই শিবরতন "নারায়ণ! নারায়ণ!" বলিতে বলিতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে তাঁহার গিরিবালাও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোম্‌টা আর একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া একপাশ হইয়া দাঁড়াইল। শিবরতন গিয়া আসনে বসিলেন।

জয়া ত্রস্ত হস্তে গিরিবালার একটা হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া

নিয়া বলিল, গিরি, বঠ্‌ঠাকুরকে বল্ যে, আজ সকালের গাড়ীতেই আমি কল্‌কাতা যেতে চাই, তাঁর অনুমতি চাচ্ছি।

শিবরতন সমস্তই শুনিতে পাইলেন এবং গিরিবালার অনাবশ্যক আবৃত্তির পূর্ব্বেই তিনি ন-বৌমার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তারপরে বলিলেন, সে কেমন ক'রে হতে পারে ন-বৌমা? সে যে হতেই পারে না।.....ভাল কথা, তুমি কাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ' কল্‌কাতা শুনি?

জয়া নীরব হইয়া রহিল।

শিবরতন বুঝিলেন। বলিলেন, বিভূতি? বিভূতির যাওয়াতো হ'তেই পারে না। আজ যে মাপ-জোখ ক'রে ভিটে আমাদের তিন অংশে ভাগ ক'রে নিতে হবে। সে উপস্থিত না থাকলে ভাগ-বাটোয়ারা মাপ-জোখ হয় কেমন ক'রে? আর তোমারও ত এ সময় থাকা উচিত। তোমারটা তুমিই বা দেখে নিতে ছাড়বে কেন?

জয়া ক্ষণিক নীরব থাকিয়া বলিল, ও গিরি, বঠ্‌ঠাকুরকে বল্ যে তিনি তাঁর বাড়ীর যেটুকু অংশ স্বেচ্ছায় আমাদের দেবেন সেটুকু গ্রহণ ক'রেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চুল-চিরে তা'বলে আমরা মাপামাপি করতে পারব না।

শিবরতন সহসা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ও তোমার রাগের কথা মা। আচ্ছা, তা বরং তুমি তোমার বাপের বাড়ী থেকেই ঘুরে এসো, তা বেশ! তারপরই না হয় এসব হবে। দু'দিনে এমন আর কিই বা এসে যাবে।

জয়া হৃদয়ের উল্লাস চাপিতেই যেন সেখান হইতে দ্রুত সরিয়া

যাইতেছিল, কিন্তু শিবরতন আবার তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিলেন, ন-বৌমা, বিভূতি তোমাকে সব কথা খুলেই বলেছে নিশ্চয়, তবু আর একবার তোমাকে আমি স্মরণ করিয়ে দি,—আমার জন্যে বা তোমার গিন্নির জন্যে তুমি যেন না কোথাও মাথা হেঁট করো।

গিন্নিবালা ততক্ষণে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। জয়া সমস্ত শুনিয়া নীরবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবরতন সন্ধ্যাহ্নিকে মন দিলেন। তাহা দেখিয়া জয়াও সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

শম্ভুরতন তখন উঠানের মাঝে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল, আমি জানতে চাই, এ বাড়ীতে আজ হাঁড়ি চড়বে কিনা। রোজ রোজ না খেয়ে কাছারী যেতে আমি পারব না, পারব না। চাকরি আমার তা'তে থাকে ভাল, না থাকে নেই নেই।

গিন্নিবালা উঠানের পাশ দিয়া ন-খুড়ীমার ঘরের দিকেই যাইতেছিল। শম্ভুরতনের দৃষ্টি সে এড়াইতে পারিল না। শম্ভুরতন তাহার অম্বুদগম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিল, গিন্নি! গিন্নিবালা সে ডাক শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠানের এক পাশেই দাঁড়াইয়া গেল।

শম্ভুরতন বলিল, গিন্নি, বৌ'ঠান্‌কে জিগ্যেস্ ক'রে আসতো তিনি আমার কাছারীর ভাত বেঁধে দেবেন কিনা। না দেন—বেশ, আমি তার পষ্টাপষ্টি জবাব শুনতে চাই। রোজ রোজ উপোষ ক'রে আর কাছারী যাওয়া আমার পোষাবে না।

গিরিবালাকে আর এ সংবাদ মায়ের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হইল না। কেননা, শম্ভুরতনের সহজ অবস্থার কণ্ঠস্বরই বাড়ীর সীমানা ডিঙ্গাইয়া অন্যত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহাতে আবার ইহা তাহার মনের এই উত্তেজিত অবস্থার কণ্ঠস্বর।

বড়বৌ নিজের ঘরে বসিয়াই শম্ভুরতনের কথা শুনিল এবং মনে মনে খুশী হইয়া উঠিয়া নিজের মনের যত কিছু বিক্ষোভ মিটাইবার জন্যই যেন কণ্ঠে যথাসম্ভব বিষ ঢালিয়া শম্ভুরতন শুনিতে পায় এমন উচ্চকণ্ঠেই বলিল, কেন? এখন আবার বৌ'ঠান্‌কে কেন? সে কি মৈত্র-বাড়ীর মাইনে করা সরকারী রাঁধুনী বাম্‌নী নাকি যে দশজনেরটা রেঁধে দিতে যাবে? যাদের রথ চ'লবে না তাদের উপোষী থাকলেই হবে। বড় বো'ঠান্ তার করবে কি শুনি?

শম্ভুরতন একেবারে মহা আক্রোশে ফাটিয়া পড়িয়া বলিল, শত্তুর! শত্তুর! এ বাড়ীতে আর মানুষ নেই কেউ, স-ব শত্তুরে দাঁড়িয়েছে!

গিরিবালা শম্ভুরতনের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

—আচ্ছা দেখে নেব', দেখে নেব' আমি। কে এ বাড়ীর কত বড় শত্তুতা আমার সঙ্গে সাধতে পারে। মৈত্র-বাড়ীর ভিটে হবে মাপ-জোখ্! কার কত বড় মাথা আসুক দেখি ভাগ করতে, এই উঠানে যদি আজ রক্তগঙ্গা বইয়ে না দি' ত' আমার নাম শম্ভুরতনই না। বড়দা' ব'লে কি আমার মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি!—বলিয়া শম্ভু-রতন উত্তেজনায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, মুখ-চোখ তাহার অস্বাভাবিক রকম রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, হাতের মুষ্টি দৃঢ় হইয়া

উঠিয়াছিল, মাংসপেশীগুলি বক্তচাঞ্চল্যে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতে-ছিল। শম্ভুবতনের সে মূর্ত্তি যেমন ভয়াবহ তেমনই আবার প্রচ্ছন্ন সহৃদয়তায় ভরা। মৈত্র-সংসারের ভাঙ্গা নৌকার হাল সে যেন চাপিয়া ধরিয়া বিরাট ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে তাহাকে রক্ষা করার প্রয়াস পাইতেছে। শম্ভুবতনকে সে অবস্থায় অতি চমৎকার দেখাইতেছিল। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা আরও বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর অগ্নি যেন সে চোখ দিয়া ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সুপ্রশস্ত বক্ষ মুহুর্মুহু সঙ্কুচিত ও স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, দাঁত দিয়া নীচেকার ঠোঁট অতি দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া কোন ক্রমে উত্তেজনা সে যেন দাবাইয়া রাখিয়াছে।

শিবরতনের সন্ধ্যাহ্নিকে ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। তিনি কোন রকমে সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শম্ভুবতন সেদিকে পিছন দিয়া শূন্যে দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই শিবরতনের আগমন সে টের পায় নাই।

শিবরতন ডাকিলেন, শম্ভু। কণ্ঠ তাহার শাসনের সুস্পষ্ট গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ।

শম্ভুবতন মুহূর্ত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শিবরতন আবার জোর দিয়া বলিলেন, শম্ভু। এসব বর্ব্বরের মত আচরণ তুমি শিখলে কার কাছে আমি জানতে চাই।

শম্ভুবতন কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া শেষে কণ্ঠ যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখিতে সচেষ্ট হইয়া বলিল, আমি কি রোজ রোজ না খেয়ে কাছারী যাব নাকি?

শিবরতন কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর যেন শূন্য লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বিভূতি ন'বৌমাকে নিয়ে কি বাপের বাড়ী রওনা হ'য়ে গেছে? তা হ'লে তারাও ত' বুঝি কিছু না খেয়েই চ'লে গেল। এ যে কি সুরু হ'লো! একটু থামিয়া ডাকিলেন, গিরি, অ গিরি!—গিরিবালাকে ডাকিতে ডাকিতে তিনি বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

গিরিবালা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন, যোগীনকে একটু তামাক দিয়ে যেতে বল ত'। আর বড় বৌকে গিয়ে বল্, শম্ভুর উপোষী মুখে কাছারী যাওয়া আমাকে কতদিন চোখে দেখতে হবে?

গিরিবালা চলিয়া গেলে শিবরতন চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া বসিলেন। এই সেইস্থান—যেখানে বসিয়া শিবরতন বিভূতিকে ন-বৌয়ের মাথায় জুতা তুলিয়া দিয়া উঠানে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হুকুম দিয়াছিলেন। সেই হইতেই একটার পর একটা যত অশান্তি উৎপাতের সৃষ্টি, সেই হইতেই রাজসাহীর বিরাজপুর গ্রামের মৈত্রদের সোনার সংসারে আগুন লাগিয়াছে। শিবরতন হতাশ হইয়া তাই ভাবিতেছিলেন। একদিন বুকে বল-ভরসা ছিল কত, কোনও ঝড়-ঝঞ্ঝাকেই তিনি এত বড় বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই যাহা তাঁহার সোনার সংসারের একটা মিনারের চূড়াও স্পর্শ করিতে পারে, আর আজ নিজেকে কত শক্তিহীন, কত দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইতেছে। এই সামান্য একটা ঝাপ্‌টায় সোনার সংসারের পাকা ভিঁতও নড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এমন সামর্থ্য নাই যে তিনি আবার তাহা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

যোগীন আসিয়া যথাকালে তামাক দিয়া গেল এবং সে তামাক যথারীতি অনাদরে পুড়িয়া ছাই হইয়াও গেল।

কেবলই তাঁহার থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল, এই সেই স্থান—যেখানে বসিয়া তিনি মাতৃ অবমাননার সুবিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মা'ও আজ জীবিত নাই, সোনার সংসারেও ভাঙ্গন ধরিল। সে ভাঙ্গন বুঝি আর জোড়া লাগে না।

২৭

ট্রেণ ছাড়িয়া দিতেই বিভূতি বলিল, জয়া, এই যে তুমি বিরাজপুরের মৈত্র-বাড়ী ছাড়লে আর তোমাকে কখনও আমি এখানে ফিরে আসতে দেব' না।

জয়ার চোখে তখন নূতন স্বপ্ন। নূতন পথের সে অস্পষ্ট নিশানা দেখিতে পাইয়াছে। স্বপ্নাতুর চোখে তাহার কেমন একটু দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, কি? কি বললে তুমি? মৈত্র-বাড়ীর কি?

বিভূতি কৃত্রিম বিরক্তি কণ্ঠে ফুটাইয়া বলিল, আমার কোনো কথা যেন তোমার কানেই যায় না। আমি যেন তোমার কেউ নই।

শেষের কথাটায় বিভূতির কিছুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না, অকৃত্রিম অভিমানে তাহা ভারাক্রান্ত।

জয়া মধুর একটু হাসিয়া বিভূতির একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া নিয়া বলিল, ছি! ওকথা ব'লো না তা'বলে। তুমি যে আমার

এ সব কথা বলিতে তাহার লজ্জা করে। মধ্যপথেই তাই তাহাকে থামিতে হইল।

বিভূতি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল, সে তুমি যাই বল' জয়া, বিরাজপুরের মৈত্র-বাড়ীতে আর আমি তোমাকে ফিরে যেতে দিতে পারব' না। ও-বাড়ীতে আর বেশী দিন থাকলে তুমি বাঁচবে না কিছুতেই। এই ক'দিনে তোমার যা চেহারা হয়েচে তা যদি একবারও লক্ষ্য ক'রে দেখতে!

জয়া স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া এতক্ষণ খেলা করিতেছিল, ধীরে ধীরে সে হাতটা স্বামীর কোলের উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, মেয়েরা যখন ব্রতধারণ করে তখন তা'দের চেহারা অমন একটু বদলায় বই কি! সে জন্যে বিচলিত হবার কি আছে?

বিভূতি সহজ বিস্ময়ে বলিল, ব্রতধারণ? তুমি এই শরীরে আবার কি ব্রত ধারণ করলে, জয়া? তুমি নিজেকে কিছুতে বাঁচতে দেবে না দেখচি। একেইতো একটু সামান্য উত্তেজনায় আজকাল তোমার ফিট্ দেখা দিচ্ছে। আমি আর পারি না তোমাকে নিয়ে জয়া!

জয়া বিভূতির অসহায় মুখের পানে চাহিয়া বলিল, হুঁ, ব্রতধারণ করেছি বই কি! সেদিন যে মৈত্র-বাড়ীর গৃহ-দেবতার কাছে দাঁড়িয়ে আমি শপথ গ্রহণ করেছি, আমার জীবিত কাল পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে ভাইয়ে ভাইয়ে আমি ভাগ হ'তে দেব' না, কিছুতেই না। সে শপথ তো আমি ভাঙ্গতে পারব' না।

বিভূতির মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। বলিল, এ তুমি ক'রেছো

কি জয়া। তোমার কতটুকু শক্তি যে তুমি বাধা দেবে এ ভাঙ্গনে। যদি কেউ তা পারত' তো সে পারতেন বড়দা'। কিন্তু তিনি যে ফিরে দাঁড়িয়েছেন। সে কি তুমি জান' না?

জয়া বলিল, খুব জানি। আরও ভাল ক'রে জানি যে, কত সামান্য আমার শক্তি। কিন্তু তুমি যে আছ আমার, তুমি যে আমার সাহস জোগাবে, অভয় দেবে, নইলে একলার কতটুকু আমার সামর্থ্য।

বিভূতির বিস্ময়ের যেটুকু বাকী ছিল তাহাও সম্পূর্ণ হইয়া গেল। সে আর ইহার পরে কি যে বলিবে তাহার ভাষাও খুঁজিয়া পাইতেছিল না। একটা বিমূঢ় স্তম্ভিত ভাব লইয়া জানালা দিয়া বাহিরের শ্যাম বনশ্রীর দিকে অলস অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া নিশ্চুপ বসিয়া রহিল।

পরের দিন ভোরে বিভূতি ও জয়া একটা সেকেণ্ড্ ক্লাশ ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া আসিয়া একটা বৃহৎ ভবনের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই জয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পূর্ব্বেও কিন্তু তাহার মুখে সুন্দর হাসি জড়াইয়া ছিল।

জয়া বলিল, কি জানি, মা যদি রাজী না হন।

বিভূতির সে ভয় পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কাজেই উত্তর দিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না। চুপি চুপি বলিল, জয়া, বড়দা'র কথা তা ব'লে লঙ্ঘন হ'তে আমি দেব' না।

জয়া আর কোন' কথা না বলিয়া গাড়ী হইতে নামিল। পিছনে বিভূতি নামিল।

দেখিতে দেখিতে বিভূতির শাশুড়ী তাহার পুত্র-কন্যাসহ একেবারে সোল্লাসে জয়াকে বারান্দার মাঝপথেই আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। জয়া কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, কেমন, তখন যে ব'লেছিলাম—আমাব কথা কি মেয়ের কানে গেল। ভাসুরের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে বুঝি আর থাকা পোষালো না? তখন যে বড় বড়-গলা ক'রে গেলি, শেষ পর্য্যন্ত সেই তাড়িয়ে দিলে ত'।

জয়ার কণ্ঠ সুস্পষ্ট দুর্ব্বলতায কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল, মা, সে মানুষকে তোমরা আজও চেনো নি, তাঁব সম্বন্ধে সাবধান হ'য়ে কথা কইতে শেখো।

বিভূতি পিছন হইতে ডাকিল, জয়া!

অদ্ভুত তাহার সে ডাক। উপস্থিত সকলেই বিভূতির এ নূতন কণ্ঠস্বরে ভয়চকিত হইয়া গেল এবং বিভূতি ও জযা যে এক গুরুতব কর্ত্তব্য সম্পাদনেব জন্যই এখানে আসিয়াছে তাহাতে কাহারও আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। বিভূতির শাশুড়ীও তাহার সে কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

ক্ষণেকের জন্য সেখানে সুনিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। তারপরে জয়া যথাসম্ভব কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, আমি এসেচি এখানে—

আবার একটু থামিয়া বলিল, আমার গিরির সঙ্গে যদি শিশিরের বিয়ে হয় তো তোমাদের আপত্তি আছে কিনা জানতে।

জয়ার মা'র মুখে সহসা একটা অস্পষ্ট কুটিল বক্র হাসি চকিতে খেলিয়া গেল। উপস্থিত অনেকেই হয়ত' তাহা লক্ষ্য করে নাই,

জয়ার তখনকার মনের অবস্থা তাহা লক্ষ্য করিবার সম্পূর্ণ বিরোধী; কারণ, সে জানিত—এই তাহার শেষ সম্বল, এই তাহার ব্রহ্মাস্ত্র—ইহাতেও যদি মৈত্র-বাড়ীর ভাঙ্গন-ধরা সংসার-নদীর পাড়ের বাঁধ বাঁধিতে সে সক্ষম না হয় তো আর কিছুতেই সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। আর সে অস্ত্রও রহিয়াছে তাহার মায়ের হাতে—কোন' তপস্যাই যাহার কঠিন হৃদয় দ্রব করিয়া বর লাভে অধিকারী করিতে কাহাকেও পারে না বলিয়া জয়ার ধারণা। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীর তাহার শির্ শির্ করিয়া বেতস-পত্রের মত কাঁপিতেছিল। বিভূতি তাহা লক্ষ্য করিয়া ঠিক জয়ার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা বলিলেন, আপত্তি?···বিরাজপুরের মৈত্র বাড়ীতে এক মেয়ের বিয়ে দিলাম সে হ'য়ে গেল পর। তারপরে আবার সেখানে যাবো ছেলের বিয়ে দিতে! মা হ'য়ে সে আমি পারবো না জয়া।

জয়া মুহূর্ত্তে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিভূতি ভয় পাইয়া গেল। চকিতে সে জয়ার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল, পাছে জয়া আর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে—এই ভয়ে।

জয়া অশ্রু-দুর্ব্বল কণ্ঠে বলিল, আমাকে বাইরে নিয়ে চল', এখানে আর এক মুহূর্ত্তও আমি দাঁড়াতে পারচি না।

বিভূতি তাহাই করিল। গাড়োয়ান তখনও ভাড়া বুঝিয়া পায় নাই, কাজেই দরজার সাম্‌নেই গাড়ী রাখিয়া ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াইতেছিল। বিভূতি আর জয়া বাহির হইয়া আসিতেই গাড়োয়ান তাহাদের উদ্দেশ্য মনে মনে অনুমান করিয়া লইয়া গাড়ীর বন্ধ দরজা

আবার খুলিয়া দিল। বিভূতি জয়াকে গাড়ীতে তুলিয়া নিজেও গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

বিভূতির শাশুড়ী প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন। তারপরে সহসা একেবারে ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন, এই কি তোমাদের উচিত হ'লো, বিভূতি? পেটের মেয়ে করবে শত্রুতা আমার সঙ্গে, আর আমি তাই মুখ বুজে সইব'। কখনও না, বিরাজপুরের মৈত্র-বাড়ীতে আমি কখনই পারব' না আমার ছেলের বিয়ে দিতে। মেয়ে আমার পর হ'য়ে যায় যাক্, কিন্তু ছেলে আমার পর হ'যে যাবে, আমার সঙ্গে করবে শত্রুতা, সে আমি কিছুতেই সইতে পারব' না। বিরাজপুরে যদি আমাকে কাজ করতেই হয় তো বুড়ীর সঙ্গে দেব' আমি শিশিরের বিয়ে, কিন্তু মৈত্র-বাড়ীতে আর না।

বিভূতি এত কথার কোন' উত্তর না দিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী ছাড়িতে বলিল। জয়ার কানে হয়ত' ইহার একবর্ণও গেল না।

২৮

বিভূতির কোনো কথা, কোনো মিনতি বা আবেদন জয়া গ্রাহ্য করিল না। শরীরের কথা পাড়িয়া বিভূতি জয়াকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না,—একদিনের জন্যও আর কলিকাতায় রাখিতে পারিল না। সেই রাত্রের ট্রেণেই আবার জয়াকে লইয়া তাহাকে বিরাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হইতে হইল।

বিভূতি বলিয়াছিল, এ অবস্থায় তুমি বিরাজপুরে ফিরলে আর তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ক'দিন ক'ল্‌কাতা থেকে শরীরের চিকিৎসা ক'রে নাও, তা'পর আবার সেখানে আত্মাহুতি দিতে যেও।

জয়া সে-কথার উত্তরে শুধু বলিয়াছিল, শরীর সারাতেতো আমি ক'ল্‌কাতা আসিনি, আমি এসেছিলাম আমার গিরির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে। তা যখন হ'লো না তখন আমাকে ফিরে যেতেই হবে।

বিভূতি জয়াকে এতদিনে ভাল করিয়াই চিনিয়াছিল। কাজেই দ্বিতীয় বার আর কোনও অনুরোধ জানায় নাই।

সমস্ত পথ জয়া কেমন অসাড় নিস্পন্দ অবস্থায় আসিল। একটি কথাও কহে নাই। বিভূতি দু'একবার কথা কহিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া নীরব হইয়াছিল। বিরাজপুর ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া জয়া প্রথম কথা কহিল। সভয়ে বিভূতির একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি না, আমাকে শক্ত ক'রে ধর' ; না প'ড়ে যাই। উঃ, বুক আমার কেমন করচে।

বিভূতি ইহার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তাড়াতাড়ি জয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভীষণ ভয় পাইয়া গেল।

জয়ার সুন্দর শান্ত চোখ দুইটা তখন ফুলিয়া রক্তজবার মত ঘন লাল হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত গা দিয়া যেন আগুনের হল্‌কা ছুটিতেছে।

জয়া সহসা আবার বাষ্পাকুল কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি আমার এ মুখ নিয়ে কেমন ক'রে বঠ্‌ঠাকুরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াব। মৈত্র-বাড়ীর ন-বৌ এত ছোট মুখ নিয়ে কেমন ক'রে সে-বাড়ীতে আবার পা দেবে! কেন বঠ্‌ ঠাকুর আমাকে প্রার্থনা বা আব্দার জানাতে মানা করলেন, নইলেত আমি মার পা জড়িয়ে ধ'রেও তাঁর শিশিরকে চেয়ে নিতে পারতাম আমার গিরির জন্যে। উঃ, বঠ্‌ ঠাকুরও শেষে আমার সঙ্গে শত্রুতা সুরু করলেন! আর আমি পারি না, মা-গো।

বিভূতি বারণ করিয়াও ন-বৌকে শান্ত করিতে পারে নাই, বাধা দিয়াও থামাইতে পারে নাই। এতক্ষণে সে সংজ্ঞা হারাইয়া স্তব্ধ হইল। বিভূতি পূর্ব্ব হইতেই তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল, কাজেই বিপত্তি তেমন কিছু আর ঘটিতে পাইল না।

মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা চতুর্দ্দিকে জানাজানি হইয়া গেল যে, মৈত্র-বাড়ীর ন-বৌয়ের ষ্টেশনে সহসা ফিট্‌ হইয়াছে।

বিরাজপুরের ষ্টেশন মাষ্টার ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, বিভূতির কোলে মাথা রাখিয়া জয়া পড়িয়া আছে। বিভূতি ইহারই মধ্যে কোনো ক্রমে সেখানে একটা সতরঞ্চি বিছাইয়া জয়াকে নিজের কোলের উপর শোয়াইয়া দিয়াছিল। জয়ার শরীরের উত্তাপে বিভূতির দেহ যেন পুড়িয়া যাইতেছিল।

ষ্টেশন মাস্‌টার এ অবস্থায় তাহাদের দেখিয়া প্রথমটা কেমন

হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল এবং পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, এখানে এ ভাবে না থেকে আমার ওখানে এখন ওঁকে নিয়ে যাওয়া চলবে না কি ?

বিভূতি বলিল, না, তা সম্ভব হ'লেও ক'রে কাজ নেই। আপনি বরং পারলে কাউকে দিয়ে বাড়ীতে একটা খবর পাঠান্।

ষ্টেশন মাস্টার তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতেই চলিয়া গেল।

বাড়ীতে খবর পৌঁছিতেই বাড়ী হইতে গাড়ী আসিল এবং সে গাড়ীতে আসিলেন শিবরতন স্বয়ং। শিবরতনের মুখের চেহারা তখন সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া গেছে। ষ্টেশন মাস্টার কি যেন বলিতে আগাইয়া আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সভয়ে থামিয়া গেল।

শিবরতন বিভূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বিভূতি, মা'কে আমার ধ'রে নিয়ে কি তুমি গাড়ীতে তুলতে পারবে ?

বিভূতি ন-বৌয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। জয়া তখন চক্ষু মেলিয়াছে, কতকটা সুস্থও হইয়াছে এবং সমস্ত অবস্থা কতকটা যেন অনুমান করিতেও পারিতেছে। জয়ার নীরব সম্মতি পাইয়া বিভূতি বলিল, বোধ হয় পারব'।

শিবরতন বলিলেন, তবে তাই কর'।

বিভূতি জয়াকে তুলিয়া ধরিয়া গাড়ীতে আনিয়া শোয়াইয়া দিল।

শিবরতন তখন বলিলেন, বিভূতি, তুমি ঐ গাড়ীতে ব'সেই যাও। দেখো, বৌমার আমার কোনো কষ্ট হয় না যেন।···আর বদ্যিনাথ, গাড়ী খুব সাবধানে আস্তে আস্তে হাঁক'বি, হুঁস্ থাকে যেন। তারপরে বিভূতির দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, আমি পিছুপিছু হেঁটেই যাচ্ছি।

বিভূতি এই ব্যবস্থায় কেমন যেন একটু সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল। শিবরতন তাহা বুঝিলেন, বলিলেন, বিপদে মানুষের বিধিই আলাদা বিভূতি, এতে সঙ্কোচের কিছু থাকতেই পারে না। তুমি উঠে ব'সো। দেখো, মা'কে আমার দেখো।

বিভূতি সে কথার অন্যথাচরণ করিতে পারিল না, উঠিয়া বসিতেই হইল। শিবরতন সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন।

গাড়ী বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

বাড়ী পৌঁছিয়াই জয়ার খুব জ্বর দেখা দিল। জ্বরের ঘোরে সে সবকিছু কেমন ঘোলাটে দেখিতেছিল। শুধু এইটুকু তাহার হুঁস্ ছিল মাত্র যে বিভূতি গিরিবালার সাহায্যে তাহাকে আনিয়া তাহার ঘরের ঘাটের উপর শোয়াইয়া দিয়াছে। বিকালের দিকে যখন তাহার ভাল করিয়া হুঁস্ হইল তখন দেখিল, তাহার বিছানার একপাশে তাহার স্বামী ও অপর পাশে বসিয়া আছে গিরিবালা।

জয়া গিরিবালার একটা হাত নিজের হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, গিরি, বঠ্‌ঠাকুর কোথায় গেলেন রে?

গিরিবালা আস্তে করিয়া বলিল, সেই থেকে ত' বাবা ঠায় একটা মোড়া পেতে তোমার দোর গোড়ায় ব'সে আছেন, ন-খুড়ীমা।

জয়া কেমন জানি একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, তারপরে কণ্ঠস্বর ছোট করিয়া বলিল, গিরি, সন্ধ্যে হ'য়ে এলো যেবে, বঠ্‌ঠাকুরের সন্ধ্যাহ্নিকের জোগাড় করতে হবে না?

গিরিবালা বলিল, এই যাই ন-খুড়ীমা।

এমন সময় শম্ভুরতনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম অতি ভয়ে ভয়ে শিবরতনের

কাছে আসিয়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খুড়ীমার কি হ'য়েছে জ্যাঠা-মশাই ?

শিববতন সস্নেহে বামেব সুডৌল্ সুস্থ দেহটি কোলেব কাছে টানিয়া নিয়া বলিলেন, জ্বব হ'য়েচে জ্যাঠামশাই। গোলমাল কিছু ক'বো না যেন। চুপটি ক'বে এইখেনে ব'সে থাক'।

বাম বলিল, জ্বব ? খুড়ীমাব জ্বব হ'য়েছে ? কবে আবাব জ্বর ভাল হবে ?

শিববতন হাসিলেন। মানুষেব সাধ্য কি সে কথা বলে। সে শুধু জানেন নাবায়ণ। বলিলেন, তুমি এখন চুপ ক'বে এই জায়গাটিতে ব'সোতো জ্যাঠামশাই। গোল কবতে নেই।

বাম শিববতনেব কথা মত নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে চুপ কবিয়া বসিয়া বহিল।

বড-বৌ তখন সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া একাই গজ্ গজ্ কবিতে-ছিল, বলি, বোগতো বাপু আমাদেবও কালে-ভদ্রে হ'য়েছে, না হয় অমন বডলোকী ফিটেব ব্যামো টাই নেই। তা ব'লে কখনওতো এমন বাজ্যি শুদ্ধ লোককে আহাব-নিদদে ভুলে শিযবে এসে ব'সে থাকতে দেখিনি। বডলোকের মেযেব যত ন-আত্তিই আলাদা।

মেজবৌ পাশেব ঘব হইতে অমনি সায় দিয়া উঠিল, তা যা ব'লেছ দিদি, তা যা ব'লেছ।

শিববতন উভয়েব কণ্ঠই শুনিতে পাইলেন, তারপবে উঠিয়া দাঁডাইয়া ডাকিলেন, গিবি।

গিবিবালা ন খুড়ীমাব পাশ হইতে নীববে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া পিতাব সম্মুখে দাঁডাইল।

শিবরতন বলিলেন, গিরি, তোর মা'কে গিয়ে আমার নাম ক'রে বল্ যে, এ বাড়ীর আইন-কানুন তার পছন্দ' না হ'লে সে অন্যত্র যেতে পারে, কিন্তু এখানে ব'সে তার আর প্রতিবাদ চলবে না।

গিরিবালার যাইতে হইল না, কেন না শিবরতনের কথাই বড় বৌ ও মেজবৌয়ের কানে গিয়াছিল এবং তাহারা যথাকালে চুপও করিয়াছিল। গিরিবালা তখন পিতার সন্ধ্যাহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিতে চলিয়া গেল। গিরিবালার প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভুরতন কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং উঠানে পা দিয়াই সহসা তাহার মাথা গরম হইয়া গেল। সহসা মাথা গরম হইয়া যাওয়ার যথোচিত কারণও বর্ত্তমান ছিল। আজ সে তাহার মাহিনা পাইয়াছে, কিন্তু সারাপথ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই এ মাহিনা কাহার হাতে ধরিয়া দিবে। চিরদিন বড় ভাইয়ের হাতে ধরিয়া দেওয়ার বিধিই এ বাড়ীতে প্রচলিত ছিল এবং আজও যদি সে বিধি প্রচলিত থাকিত' তো সে অনেক দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিত। কিন্তু আজ দাদা যদি গ্রহণ করিতে রাজী না হন! শম্ভুরতনের মাথায় আগুন ধরিয়া গেল।

সে উঠানে পা দিয়াই একটা 'On His Majesty s Service' মার্কা পুরাতন খামে মোড়া টাকা ও নোট ঝণাৎ করিয়া সেখানে ফেলিয়া দিয়া উন্মত্ত আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিল, রইলো এই মাইনে আমার উঠনে প'ড়ে, বড়দা'র খুশী হ'লে তিনি তুলে নেবেন, না নেন্ সেও তিনিই বুঝবেন। ও বোঝা আমি বইতে পারব' না, কখ্খনও না, কিছুতে না। আলাদা ক'রে দিলেই হ'লো যেন!

মেজবৌ দরজায় দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিল এবং ধীরে ধীরে উঠানে নামিয়া আসিয়া আস্তে করিয়া বলিল, থাক্, আর অত দাদা-গত প্রাণ দেখিয়ে কাজ নেই। বেশ, তিনি রাখবেন না যখন তাঁর সংসারে, তখন আমাদেরটাও আমরা ষোল-আনা বুঝে নেব'। মাইনের টাকা কি আমরা রাখতে জানি না যে পথে-ঘাটে তা ছড়িয়ে দিতে হবে?

বলিয়া মেজবৌ উঠান হইতে সেই থাম তুলিয়া লইতে গেল। শম্ভুরতন একটা আঙ্গুল তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, খবর্দ্দার!

শম্ভুরতনের গর্জ্জনে সমস্ত বাড়ীখানা যেন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। রাম ভয়ে ভয়ে ন-খুড়ীমার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

শিবরতন উঠানে নামিয়া আসিলেন। ডাকিলেন, শম্ভু।

শম্ভুরতন সমাধিস্থ হইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া গেল। মেজবৌ ঘোমটা তুলিয়া দিয়া চোরের মত নিতান্ত চুপি চুপি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

শিবরতন বলিলেন, শম্ভু, আর তোমার কবে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে শুনি?

শম্ভুরতন কি যেন বলিতে যাইতেছিল, শিবরতন অপাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত থামখানার দিকে চাহিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, চুপ। ন-বৌমার জ্বর, ভীষণ জ্বর।

শম্ভুরতন ন-বৌয়ের জ্বরের কথা শুনিয়া একেবারে ম্লান হইয়া গেল। কই, সে কথা তো একবারও কেহ তাহাকে বলে নাই। আর ন-বৌমা ফিরিয়াই বা আসিল কখন কে জানে! সে নিজেকে অত্যন্ত

বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিল এবং সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল তাহার দাদার উপর। সত্যই এ অবস্থায় চীৎকার করাটা তাহার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইয়া গেছে। কিন্তু আজ কাহার হাতে আনিয়া মাহিনার টাকা ধরিয়া দিতে হইবে এ দুর্ভাবনা না থাকিলে এমন অপ্রস্তুতে তো তাহাকে পড়িতে হইত না।

শম্ভুরতন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠানের একপাশের বারান্দায় গিয়া উঠিয়া বসিল।

শিবরতন নিঃশব্দে উঠান হইতে থামে মোড়া টাকা ও নোট তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভুরতনের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সকলেই অনুযোগ করে তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই। বুদ্ধি-শুদ্ধি? তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকিয়া লাভ? এ সংসারে তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি কবে আবার কাজে লাগিয়াছে? না, না। এই যা আছে, ইহার বেশী বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকিয়াও তাহার কাজ নাই। দাদার কৃতিত্বে খুশী হইয়া শম্ভুরতন পরমানন্দে পা দুলাইতে লাগিল।

রাত বারোটার পরে জয়ার জ্বরের ঘোর আরও বাড়িয়া গেল। জয়ার তখন ভাল করিয়া হুঁস ছিল না।

শিবরতন দরজার বাহিরে মোড়ার উপর মুহ্যমানের মত বসিয়াছিলেন। আর তাঁহারই পায়ের কাছে মেঝের উপর শম্ভুরতন বসিয়াছিল। জয়ার শয্যার দুইপার্শ্বে গিরিবালা ও বিভূতিরতন।

শিবরতন একসময় সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, নারায়ণ! নারায়ণ! মা, কেন যে অবুঝের মত গৃহদেবতার কাছে এমন শপথ গ্রহণ করতে গেলে তাতো আমি ভেবে পাই না। নারায়ণ, তোমার মঙ্গল করুন্।

আবার কিছুক্ষণ সকলেই নীরব।

তাবপরে কথা কহিল জয়া। জয়া জ্বরের ঘোরেই বলিতে লাগিল, এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি কেন সব এমন হ'য়ে গেল! ওগো, শুনচো?—বলিযা জয়া বিভূতিকে একটা ধাক্কা দিয়া আবার বলিল, এব প্রতিকারতো আমাদেরই হাতে র'য়েচে। আমাদের পাপেই না এমন হ'য়েচে। বঠ্ঠাকুরের কথা আমবা বর্ণে বর্ণে সেদিন পালন কবিনি, তাই না আজ এমন হ'যেচে।

বিভূতি জযাকে যা। বার কথা কহিতে নিষেধ করিল, কিন্তু জয়া সে নিষেধ শুনিল না। বলিযা চলিল, বঠ্ঠাকুর ব'লেছিলেন, তুমি আমার মাথায় তোমার জুতোর পাটি তুলে দিয়ে আমাকে উঠনে দাঁড় করিয়ে রাখবে। কিন্তু কই, বঠ্ঠাকুরের সে কথাতো আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিনি। তাই বোধ হয় মা আজও আমাদের ক্ষমা করেন নি।

জয়া আবার নীরব হইল। গিরিবালা জয়ার মাথার রাশীকৃত চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া তাহার কপালের দুইপাশ টিপিয়া দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কোনোই ফল-হইল না। জয়া আবার একসময় বিভূতির হাত দুইটা এক করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ওগো, তুমি আমার কথা রাখ'। দেখো,

আবার সব যেমন ছিল তেমন হবে। তুমি আমাকে ধ'রে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে উঠনে দাঁড় করিয়ে তোমার সে জুতোর পাটি আমার মাথায় তুলে দিয়ে দাঁড়াও, আমি দেখে নেব, কেমন না আবার আমাদের এ ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগে।.....

শিবরতন সমস্তই শুনিতে পাইলেন। বলিলেন, বিভূতি, গিরিকে বৌ-মার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে বল্, নইলে ঘুমতো কিছুতে আসবে না।

জয়া ভাসুরের কথা সমস্তই শুনিল, শুনিয়া বিশেষ লজ্জিত হইয়া অতি চাপাকণ্ঠে বলিল, ও মাগো! বঠ্ঠাকুর এখনও কি বাইরেই ব'সে আছেন? তাঁকে শু'তে যেতে বল', রাত যে অনেক হ'লো।

তারপরে জয়া অতি ব্যথায় গিরিবালার একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া ধরিয়া বুকের উপর তাহা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বুকটা আমার কাঁপচে, নারে গিরি? কিন্তু দেখিস্, দু' চার দিনে আবার আমি ভাল হ'য়ে উঠবো। বঠ্ঠাকুর যে ব'লেচেন, তাঁর কথাতো আর মিথ্যা হ'তে পারে না।

২৯

জয়ার বাড়াবাড়ি অসুখের সময় তার মা, শিশির এবং বিভূতি আসিয়াছিলেন। সাতদিন পর জ্বর ত্যাগ হইল, বিভূতির আর থাকিবার উপায় ছিল না, সে তারপর দিনই কলিকাতা চলিয়া গেল। জয়ার মাও জামাইয়ের সঙ্গে গেলেন—শিশির রহিয়া গেল।

যাইবার পূর্ব্বে বিভূতি জয়ার কাছে আসিয়া তার হাতে একটা কাগজের তাড়া দিয়া বলিল, এটা তুমি ভাল ক'রে রেখে দিও।

ক্ষীণ কণ্ঠে জয়া বলিল, কি ওটা?

বিভূতি বলিল, তুমি যা চেয়েছিলে তাই। আর কিছু বলিল না। তার মুখখানা একটু ভার ভার।

জয়া তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলিয়া দেখিল, একখানা দলিল—নিতাই চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তির কবালা। এই সম্পত্তি কেনা লইয়া অনেক কথাই বাড়ীতে হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে পরিবারে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জয়ার মনের ভিতর কাঁটার মত বিঁধিয়া ছিল। তার রোগের প্রলাপের ভিতরও সে ইহার কথা অনেকবার বলিয়াছিল, ঐ সম্পত্তি যদি তার নামে কেনা হয় তবে সে বাঁচিবে না।

দলিলের শিরোভাগ দেখিয়াই জয়ার মুখ উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। সম্পত্তি কেনা হইয়াছে, কিন্তু জয়ার নামে নয়, তিন বধূর নামে, তাদের নিজস্ব স্ত্রীধন স্বরূপ।

জয়ার উল্লাস হইল এই ভাবিয়া যে ইহাতে বুঝিবা মৈত্র-পরিবারের ভাঙ্গা হাট আবার জোড়া লাগিবে, তার নষ্ট শান্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

দলিল খানা মুড়িয়া রাখিয়া জয়া বলিল, বেশ ক'রেছ। দুর্ব্বল শরীরে তার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে পারিল না, কিন্তু তার চোখ মুখ দিয়া আশা ও আনন্দের দ্যুতি ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

বিভূতি তার এ আনন্দে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিল না। এই ব্যাপার লইয়া তার মনে ছিল একটা দারুণ অভিমান। তার এই সম্পত্তি খরিদ করিবার চেষ্টা লইয়া তাদের স্বামী স্ত্রীর ভিতর যে একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল, এবং জয়া যে তাহাকে এই কথা লইয়া গঞ্জনা দিয়াছিল, তাহাকে বাধা দিয়াছিল, সে কথা সে ভুলিতে পারে নাই। বিভূতি এবং তার শাশুড়ী জয়ার মুখ চাহিয়া তার ভালোর জন্যই জয়ার নামে এ সম্পত্তি খরিদের চেষ্টা করিয়াছিল। বিভূতির রোজগার বেশী, তবু জয়া তার স্বামীর সম্পদের সম্পূর্ণ সুযোগ পায় না, তাহা তার বাঁটিয়া লইতে হয় বৃহৎ পরিবারের সহিত, একথায় বিভূতি ক্ষোভ বোধ করিত বলিয়াই নিজস্ব এই সম্পত্তি করিবার তার চেষ্টা। অথচ, যার জন্য সে চুরী করিল সেই তাকে বলিল, চোর। জয়াই ইহাতে ক্ষেপিয়া উঠিল তার ভাসুর ও জা'দের চেয়ে বেশী। এ ব্যাপার লইয়া যত কাণ্ড জয়া করিয়াছে তাহার ভিতর সে একটিবার বিভূতির মুখ চাহে নাই, বিভূতিকে যে অপদস্থ হইতে হইবে সে কথা একবারও মনে ভাবে নাই। ইহাতে বিভূতির মনে হইয়াছিল একটা প্রচণ্ড অভিমান। সে ভাবিতেছিল যে, জয়া তার ভালোবাসার বা সমাদরের সম্মান রাখে নাই, ভালো সে তাকে বাসেই না। বিভূতি তাকে প্রিয়ার সিংহাসনে বসাইয়া তাকে প্রেম ও সেবা দিয়া পূজা করিয়াছে, কিন্তু জয়া তার সে সমাদর বা সেবার কোনও সাড়াই দেয় নাই। বিভূতির প্রিয়া সে হইতে পারে

নাই, সে হইয়াছে আদ্যোপান্ত শুধু—মৈত্র-বাড়ীর বউ। মৈত্র-বংশের এক ফোঁটা রক্ত তার দেহে নাই, কিন্তু এই প্রাচীন পরিবার তার সমগ্র অতীত, সকল সংস্কার, প্রতিষ্ঠা ও অভিমান লইয়া যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মৈত্র-বংশের সম্মান, এই বংশের প্রাচীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠা, ইহাই যেন তার সর্ব্বস্ব, বিভূতি—শুধু মৈত্র-বংশের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ বই তার কাছে কিছুই নয়। বিভূতির প্রেমের চেয়ে, ভাসুরের সমাদর, মৈত্র-পরিবারের আশ্রিত ও কুটুম্বদের কাছে প্রতিষ্ঠা জয়ার কাছে অনেক বড়।

একথা ভাবিয়া বিভূতির প্রেমপ্রবণ চিত্ত একটা শক্ত আঘাত পাইয়াছিল। কিন্তু সে কথা লইয়া জয়ার সঙ্গে যে একটা বোঝা পড়া করিবে, রাগ বা অভিমান দেখাইবে, সে সুযোগ পর্য্যন্ত তার নাই। জয়ার এই অসুস্থ শরীরে সে কি বলিবে?—এখন তো ঝগড়া করিবার সময় নয়।

তাই জয়া যখন প্রলাপের ঝোঁকে এই নিতাই চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি খরিদের কথা তুলিয়া বলিল, যে ও-সম্পত্তি তার নামে কিনিলে সে বাঁচিবে না, তখন কতকটা ভয়ে কতক অভিমানে বিভূতি ছুটিয়া গেল নিতাই চক্রবর্ত্তীর কাছে। সম্পত্তির বায়না হইয়াই ছিল, আজ কালের ভিতর কবালা করিয়া লইবার কথাও ছিল। কেবল জয়ার অসুখের জন্য কাজটা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

বিভূতি গিয়া নিতাই চক্রবর্ত্তীকে বলিল আজই লেখাপড়াটা হ'য়ে যা'ক।

ষ্ট্যাম্প কাগজ কেনা হইয়া গিয়াছিল, মুশাবিদাও প্রস্তুত ছিল। নিতাই চক্রবর্ত্তী মুহুরীকে ডাকিয়া দলিল লিখিতে বলিল। বিভূতি

বলিল, খসড়াটা একটু বদলাতে হবে। দলিল গৃহীতার নাম হবে তিন বউয়ের নাম।

নিতাই চক্রবর্ত্তী অবাক হইয়া বলিল, সে কি ?

বিভূতি বলিল, হাঁ তাই, এটা হবে তিন বউয়ের স্ত্রী-ধন।

নিতাই আর বাক্য ব্যয় না করিয়া সেই মর্ম্মে দলিল লেখাপড়া করিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিল, এবং সেই দিনই রেজেষ্ট্রি আফিসে চলিয়া গেল। তিন দিন পর দলিল ফেরত আনিয়া পণের টাকা বুঝিয়া লইয়া সে বিভূতিকে দলিল খানা দিল।

তিন বউয়ের নামে কবালা বিভূতি ইচ্ছাপূর্ব্বক করে নাই, করিয়াছিল রাগ ও অভিমান করিয়া। তাই জয়া যখন খুসী হইয়া বলিল বেশ ক'রেছ, তখন বিভূতি সে আনন্দে সাড়া দিতে পারিল না। সে শুধু গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল। তার ভাব-মুখ জয়া লক্ষ্য করিল না, বিভূতি যে তাহার নামে সম্পত্তি করিয়া জয়াকে লজ্জায় ডোবায় নাই, তার মুখরক্ষা করিয়াছে, ইহাতে জয়া এত পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছিল যে তাহার প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়া সে স্বামীর প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ জ্ঞাপন করিল, আর কিছু দেখিতেই পারিল না।

বিভূতি চলিয়া গেলে জয়া দলিলখানা গিরির হাত দিয়া শিবরতনকে পাঠাইয়া দিল। তাহার শিক্ষামত গিরি বলিল, কাকাবাবু দলিলখানা দিতে ব'লে গেছেন।

দলিলখানা পড়িয়া শিবরতন ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, কেন ? এদিয়ে আমি কি ক'রবো ?

গিবি বলিল, কাকীমা ব'ল্লে, এ সম্পত্তি নিয়ে যা কিছু করবার আপনিই ক'রবেন।

হাসিয়া শিববতন বলিলেন, পাগল, সে হয় না। চল দেখি তোর কাকীমার কাছে।

জয়ার ঘরের কাছে আসিয়া শিববতন বলিলেন, এ আবার কি হ'ল বউমা? এতো ভাল হ'ল না। কেন এ ক'রতে গেল বিভূতি?

গিরির মধ্যস্থতায় জয়া বলিল, সে আমি জানি না। উনি এখানা দিয়ে গেলেন আপনাকে দেবার জন্যে। এ সম্পত্তি নিয়ে যা ক'রবার আপনি ক রবেন।

—সে তো হয় না বউমা। এ সম্পত্তির মালিক তোমরা তিনজন। তোমরা সবাই যদি আমাকে ভার দাও, তবে দেখা-শোনা আমি ক'রতে পারি। কিন্তু তাতে সবার সম্মতি চাই। তা সে যাই হোক, এ কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না। আমাকে বিভূতি একবার জিগ্‌গেস ক রলে না!

কেন? দলিলে দোষ হয়েছে কিছু?

—দলিলে কোনও দোষ হয় নি, কিন্তু এখন এই সম্পত্তি এমনি ক'রে কিনে—এ যে আরও অশান্তির ঘর হবে মা।

জয়া বলিল, সে সব আমি কিছু জানি না। দোষ হ'য়ে থাকে তার জন্য যা' ক'রতে হয় আপনি ক'রবেন।

—সে সাধ্য আমার নেই। বলিয়া শিববতন গম্ভীর হইয়া অনেক-ক্ষণ বসিয়া ভাবিয়া শেষে বলিলেন, দেখি কি হয়।

শিববতন যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা হয় নাই।

বিভূতি তিন বধূকে সম্পত্তি কিনিয়া দিয়াছেন এ সংবাদ শুনিয়া বড় বউ শিবরতনকে বলিলেন, দেখ, এ সম্পত্তির টাকাটা যেন তুমি সব সংসারে খরচ ক'রে বসো না। এতদিন হ'ল বিয়ে হ'য়েছে, কোনও দিন তো তুমি হাত তুলে আমাকে কিছু দাওনি যে নিজের ইচ্ছেমত খরচ ক'রবো। ঠাকুরপো যখন দিয়েছে আমাদের এ সম্পত্তিটা, এর টাকাটা যেন আমি পাই।

শিবরতন স্ত্রীর কাছে বা সংসারের আর কারও কাছে এমন কথা শুনিতে এত অনভ্যস্ত যে তিনি অবাক হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি চিরদিন সংসার চালাইয়াছেন, মৈত্র পরিবারের চিরাচরিত ধারা অনুসারে। সে ধারায় পারিবারিক সম্পত্তির কোনও অংশ কারও নিজস্ব বলিয়া দাবী করিবার অধিকার ছিল না। সব ধন সম্পদ ছিল সমগ্র পরিবারের এবং তাহার বিনিয়োগ হইত পরিবারের কর্ত্তার আদেশ অনুসারে। পরিবারের কারও কোনও প্রয়োজন হইলে সেটা পরিবারের প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং সে প্রয়োজন যথা-যোগ্য ভাবে মিটাইবেন পরিবারের কর্ত্তা। ইহাই ছিল শিবরতনের মজ্জাগত সংস্কার ও শিক্ষা এবং এই নিয়ম অনুসারে, তিনি এতদিন সংসারের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন, যথাশক্তি অব্যাহত ন্যায়নিষ্ঠার সহিত। সমস্ত পরিবারের সকলের প্রয়োজনের প্রতি সমদৃষ্টি হইয়া, সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে মৈত্র-পরিবারের চিরাচরিত ধারা তিনি যেরূপ সৌষ্ঠবের সহিত বজায় রাখিয়াছেন,

তাহাতে কাহারও মনে কোনও ক্ষোভ বা অসন্তোষের সৃষ্টি হইবার হেতু হয় নাই ; বিশ্বাস ছিল যে সকলেই তাঁহারই মত আপনার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণরূপে পরিবারের ভিতর ডুবাইয়া দিয়া, পরিবারের এক-প্রাণতা ও সমগ্র মঙ্গল-সাধন করিবার জন্য আগ্রহশীল। অনেক দিন অনেকের কাছে তিনি এই কথা লইয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, সমগ্র দেশে প্রাচীন আদর্শের পরিপন্থী যে একটা উগ্র আত্ম-সর্ব্বস্বতার আন্দোলন মাথা তুলিতেছে, যাহার ফলে প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে আর তাহার স্থলে গড়িয়া উঠিতেছে এক নূতন সমাজ, যার ভিতর বন্ধনের কোনও সূত্র নাই, আছে শুধু নগ্ন স্বার্থপরতার নৃশংস সংগ্রাম, ইহার একমাত্র হেতু গৃহে গৃহে শিক্ষার অভাব ও বিকৃতি। গৃহস্বামী যদি ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হন, যদি পরিবারের সকলের মঙ্গল তিনি একত্রে সাধনার বিষয় করেন, তবে পরিবারের প্রত্যেকের ভিতর পরিবারের মঙ্গলের প্রতি অনুরাগ গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিতেন মৈত্র-পরিবারের কথা, বলিতেন সে পরিবারে কি শান্তি ও সুশৃঙ্খলতার সহিত সকলে একাগ্রভাবে পরিবারের মঙ্গল চেষ্টায় নিয়োজিত আছে, যৌথ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের স্বার্থের কথা কেহ মনেও ভাবে না।

তাঁহার এই বিশ্বাসে প্রথম আঘাত পাইলেন তিনি বিভূতির ব্যবহারে। বিভূতি যে স্বতন্ত্রভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে নিজ প্রয়োজনে, একথা যখন তিনি প্রথম বুঝিতে পারিলেন সেইদিন তিনি প্রথম বলিলেন যে মৈত্র-পরিবারেও স্বতন্ত্র স্বার্থের কল্পনা সম্ভব। এই অনুভূতি যখন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে মৈত্র-পরিবারের যে নিঃস্বার্থ

আদর্শ একত্ব কল্পনা করিয়া তিনি গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন সে একতা নাই, মনে মনে আছে স্বতন্ত্র স্বার্থ-বুদ্ধি—কেবল জ্যেষ্ঠের শাসনে তাহা প্রকাশ হইতে পরিতেছে না। তখনি শিবরতন স্থির করিলেন যে এ মেকি আর রাখিবেন না। তাই বিনা বাক্য ব্যয়ে তিনি এতদিনকার পুরাতন মৈত্র-পরিবার ভাঙ্গিয়া ভাইদের পৃথক্ করিয়া দিলেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন ইহাতে পরিবারের শান্তি ফিরিয়া আসিবে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাই হইলে তাহাদের ভিতর বিরোধ হইবার সম্ভাবনা আর থাকিবে না। বাঁশঝাড়ের ব্যাপার লইয়া বধূদের ভিতর যে কুরুক্ষেত্র লাগিয়া গিয়াছিল তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার এ আশাও দুরাশা।

কিন্তু তবু, তাঁর মনে এ বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার এখনকার যে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র পরিবার তাহার ভিতর আর ভেদের বীজ নাই। তাঁর পত্নী বা গিরিবালার সঙ্গে তাঁর অন্তরের পরিপূর্ণ একত্ব তিনি যেমন অনুভব করেন, তেমনি করিবে তাহারা। তাই এতদিন পর পত্নীর মুখে তাহার স্বাতন্ত্র্যের বাণী শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

গিরির মা অভিযোগ করিলেন যে কোনও দিন শিবরতন হাতে তুলিয়া তাঁহাকে কিছু দেন নাই—তিনি ইচ্ছামত কিছু কোনও দিন খরচ করিতে পারেন নাই,প্রত্যেক প্রয়োজনের জন্য তাঁহার হাত পাতিতে হইয়াছে স্বামীর কাছে। এ অভিযোগ এতদিন তবে তাঁহার অন্তরে পুঞ্জীভূত হইয়াইছিল, আজ সুযোগ আসিতেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমে হইল তাঁহার ক্রোধ। পরিবারের কর্ত্তা হিসাবে শিবরতনের অধিকারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে তাঁহার আহত কর্ত্তৃত্ব-বোধ প্রথমে ফোঁস্ করিয়া উঠিল। তারপর তাঁহার হইল দারুণ ক্ষোভ। হায় রে নিজ হাতে নিজের টাকা খরচ করিবার এই লোভটাই এত বড় হইল! আর শিবরতন যে এতগুলি বৎসর সমস্ত পরিবারের হইয়া সংসারের গুরুভার বহন করিলেন, তাহাদের জন্য সম্পত্তি অর্জ্জন করিলেন, তাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের হিতার্থে ব্যয় করিলেন—ইহার জন্য কাহারও কৃতজ্ঞতা নাই! কোনও বিবেচনা নাই! টাকা হাতে পাইলে খরচ করিতে লাগে ভাল, কিন্তু গুছাইয়া খরচ করিতে সবাই জানে না বা পারে না। অনিয়মিত ব্যয়ে সর্ব্বনাশই হয় বেশীর ভাগ লোকের। তাহাদের পক্ষে কোনও বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মকর্ত্তা যদি আয়-ব্যয়ের পরিপূর্ণ ভার লইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে সেই কাজ করিয়া দেন তবে সেটা অভিযোগের বিষয় নয়, কৃতজ্ঞতারই হেতু। শিবরতন সমগ্র পরিবারের পক্ষে এই দীর্ঘ সেবার পুরস্কার পাইলেন আজ তাঁর পত্নীর মুখের এই অভিযোগে!

ক্রমে তাঁহার মনের ক্ষোভ কাটিয়া গেল। তাঁহার এই অকরুণ নিয়তির কাছে তিনি অবিদ্রোহী হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূ ক্রমে সরল হইয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পর শিবরতন বলিলেন, আচ্ছা তাই হবে, তোমরা যেমন চাইবে তেমনি হবে।

জয়া শিবরতনকে ভার দিয়াছে এ সম্পত্তির। বড় বউ, ভার দেয় নাই। কিন্তু ধরিয়া লইয়াছে যে শিবরতন এ সম্পত্তি দেখা-শুনা করিবেন। কিন্তু তাহার মনের সন্দেহ যে শিবরতন ইহার উপস্বত্ব আত্মসাৎ

করিবেন। এ অবস্থায় শিবরতন কি করিবেন তাই ভাবিতে লাগিলেন, —মেজ বউয়ের মতটাও একবার জানা আবশ্যক।

শম্ভুরতনকে ডাকিয়া শিবরতন বলিলেন যে বিভূতি তিন বউকে সম্পত্তি কিনিয়া দিয়াছে, সে সম্পত্তির দেখা শোনার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

শম্ভু চট্‌পট্‌ উত্তর দিল, যা ক'রতে হয় আপনি ক'রবেন, এর আর কথা কি ?

একটা উদাস হাসি হাসিয়া শিবরতন বলিলেন, ভায়া, সম্পত্তি তোমারও নয়, আমারও নয়, বউদের। তোমার কথায় তার ব্যবস্থা হবে না। জিজ্ঞেস ক'রে এসো মালিকনীদের কাছে—বড় যউ ন'উ এর মত আমি জেনেছি, মেজ বউমার কি মত সেই কথাটা জান্‌তে চাই।

শম্ভু তবু জোর করিয়া বলিল, সে এসবের কি জানে ? যা' আপনি ক'রবেন তাই হবে। সম্পত্তির দেখা-শোনা করা আর জানে কে যে ক'রবে ?

—না হে না, তুমি জিজ্ঞেস ক'রে এসো। আমার এ ধাষ্টোমো ক'রবার আর ইচ্ছে নেই। অনেক দিন তোমাদের বিনা মাইনার ম্যানেজারী ক'রেছি, সে চাকরীর উপর আর লোভ নেই। কথাটা বেশ উষ্ণতার সহিতই বলিলেন। এ কথার পর শম্ভুর আর কোনও কথা মুখে আসিল না।

একটু আহত চিত্তে সে অন্দরে প্রবেশ করিল। সেখানে মেজ বউ প্রচণ্ড ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

স্বামী আসিতেই শিবরতন যখন তাকে ডাকিয়া লইলেন, তখনই মেজ বউ সন্দিগ্ধ হইয়া দূর হইতে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। দুই ভায়ের কথা বার্ত্তা আড়াল হইতে সব শুনিয়া সে মার্ মূর্ত্তিতে আপনার ঘরে বসিয়া স্বামীর সংবর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হইল।

শম্ভুরতন ঘরে ঢুকিতেই মেজ'বউ বলিল, কিগো, বট্'ঠাকুরের সঙ্গে কি ভাল মানুষী হ'চ্ছিল। বড়'যে বামের ভাই লক্ষ্মণ হ'য়ে সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে গিয়েছিলে, সে সম্পত্তি কি তোমার যে তুমি আদর ক'রে বড় ভাইয়ের হাতে তুলে দেবে।

শম্ভু একবার শুধু হিংস্র দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া নিজ মনে কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

মেজ বউ এর উচ্চ কণ্ঠে গর্জ্জন চলিতে লাগিল—বড় উঁচু মুখ ক'রে বল্‌ছেন বিনা মাইনার ম্যানেজারী ক'রছেন। ম্যানেজারী ক'রে যা-ক'রছেন সে সবাই জানে—কে পায় ধ'রে সাধ্‌ছে তাঁকে ম্যানেজারী ক'রতে? আর যে যা করে করুক আমি ওঁকে এ সম্পত্তির ভিতর দাঁত বসাতে দিচ্ছিনে। এতদিন ভাইদের খেয়ে পেট মোটা ক'রেছেন——খবর্দ্দার!—বলিয়া শম্ভু গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সারাদিন পরিশ্রমের পর শম্ভুর মনটা শ্রান্ত হইয়াছিল। এই অবস্থায় জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কথা কহিয়া মনটা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর ঘরে ফিরিতেই পত্নীর এই অবিশ্রান্ত একতরফা বাগ্‌যুদ্ধে সে মহা ক্ষিপ্ত-হইয়া উঠিয়াছিল। তাই যখন মেজ বউ শিবরতনের নামে এমন কুৎসা আরম্ভ করিল, তখন শম্ভু আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

খবর্দ্দার—বলিয়া গর্জ্জন করিয়া সে স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,

"দেখ ফের দাদার নামে অমন কথা বলবে তো—ঐ রাস্তায় বের-ক'রে দেব।"

মেজ বধূর আর্ত্তনাদে সমস্ত পাড়া সচকিত হইয়া ছুটিয়া আসিল, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শিবরতন আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, শম্ভু! একি ইতরামো! সঙ্কুচিত হইয়া শম্ভু সেখান হইতে পলায়ন করিল।

কান্নাকাটির পালা শেষ হইয়া গেলেও আপদ মিটিল না। শম্ভুর যদিও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল স্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটমাট করিয়া ফেলিবার, এবং যদিও নিতান্ত প্রয়োজন হইলে সে সঙ্গোপনে পত্নীর পায়ে ধরিতেও একেবারে অসম্মত ছিল না, কিন্তু পত্নী তাকে মোটেই আমল দিল না। অবশিষ্ট দিনের মধ্যে শম্ভু তার কাছে অগ্রসর হইতে পারিলনা, আর সন্ধ্যা বেলায় মেজ'বউ গোরুর গাড়ী করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

শিবরতন মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ইহার পর তিন চার দিন শিবরতন এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চ-বাচ্য করিলেন না, কেবল একাগ্রচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিলেন, তাঁহার এতদিনকার শান্তির সংসারের কোন অন্ধকার কোণে লুকাইয়াছিল এত অমঙ্গল! কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে কোন কুগ্রহের দৃষ্টিতে সে ছাড়া পাইয়া অবিশ্রান্ত প্রবাহে ঢালিয়া দিতেছে এই পরিবারের উপর তাহার পুঞ্জীভূত অভিশাপ!

জীবনে কোনও দিন তিনি পাপ চিন্তা মনে স্থান দেন নাই, নিজের বুদ্ধি ও বিবেকের নির্দ্দেশ অনুসারে অবিচলিতভাবে করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম মাথায় রাখিয়া চিরদিন পরিবারের সেবা করিয়াছেন। তবু তাঁহার অদৃষ্টে ভগবান এ শাস্তি কেন লিখিলেন?

এই অমঙ্গল প্রবাহের মূল অনুসরণ করিয়া তিনি নিজের মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এই পরিবারের গত কয়েক মাসের সমগ্র ইতিহাস। করিতে করিতে হঠাৎ তাঁর মনে হইল যে, অধর্ম্ম তিনি করিয়াছেন, এবং সেই অধর্ম্মের সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথেই প্রবেশ করিয়াছে এই পরিবারের যত অমঙ্গল।—সে পাপ, সে অধর্ম্ম, সে অবিচার—জয়ার প্রতি তাঁহার অবিচার—নিরপরাধ ভ্রাতৃবধূর প্রতি শাস্তির আদেশ।

যেদিন তিনি সে আদেশ দিয়াছিলেন সেই দিন হইতে তাঁহার এ ধর্ম্মের সংসারে ভাঙন ধরিয়াছে, সেইদিন হইতে তাঁহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে রাজ্যের অমঙ্গল।

মনে হইল রাজেশ্বর তাঁহাকে এই কথাই একদিন বলিয়াছিল। বলিয়াছিল, ঘরের লক্ষ্মীকে জুতো মাথায় করিয়া দুপুর রোদে দাঁড়াইবার আদেশ দিয়া শিবরতন লক্ষ্মীর অপমান করিয়াছেন। মনে হইল রাজেশ্বরের কথাটা সম্পূর্ণ সত্য, আজ তাঁহার যাহা কিছু শাস্তি তাহা তাঁহার পাওনা।

ভাবিলেন, কি জানি কবে তাঁহার এ শাস্তি সম্পূর্ণ হইবে, কবে তাঁহার পাপের দেনা পরিশোধ হইবে।

রাজেশ্বরের সঙ্গে কথায় কথায় শিবরতন একদিন বলিলেন, তুমি ব'লেছিলে ঠিক রাজেশ্বর, লক্ষ্মীর অপমান ক'রেছি আমি, অবিচার ক'রেছি, অধর্ম্ম ক'রেছি। ব'লতে পার কিসে এর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হবে?

এতটা গভীর বিষাদের সহিত শিবরতন কথা কয়টা বলিলেন, তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত উক্তির ভিতর এত বড় একটা তীব্র ব্যথা ঝঙ্কৃত হইয়া

উঠিল, যে ইহার উত্তরে রাজেশ্বর সে কথার পুনরাবৃত্তি না করিয়া বলিলেন, তুমি এমন ক'রে ওকথা ভেবো না শিবরতন। জীবনে ভুল কে না করে? তুমিও একটা ভুল ক'রেছ। ভগবান এত হিংস্র নন্ যে তোমার সারা জীবনের ধর্ম্ম-সাধনাকে তুচ্ছ ক'রে, তোমার সেই একটা ভুল ধ'রে তোমাকে সারাজীবন শাস্তি দেবেন! যা' হবার হ'য়ে গেছে, তা' নিয়ে অযথা বেশী মন খারাপ ক'রো না। তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও, ফলাফল তো ভগবানের হাতে।

তা ঠিক, বলিয়া শিবরতন ভাবিতে লাগিলেন, কি তাঁর কাজ?

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তো কর্ত্তব্য। কিন্তু কি প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিবেন?

ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

তারপর ভাবিলেন, কাজ তাঁহার করিতেই হইবে। কিন্তু কি যে কাজ, কি অকাজ, সেই কথাটা বোঝাই যে সব চেয়ে বড় দায়! এই যে ভার জয়া তাঁহার উপর দিয়াছে নিতাই চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার, এ সম্বন্ধেই বা তাঁহার কর্ত্তব্য কি?

প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে এই নূতন অমঙ্গলের নিদান লইয়া তিনি মাথা ঘামাইবেন না, তিনি এ সম্পত্তি স্পর্শও করিবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হইল, তবে কে ইহার ব্যবস্থা করিবে? তিনি ছাড়া আর কাহারও এ সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভব নয়। একে তো শম্ভু বা বিভূতির সম্পত্তি শাসন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নাই। তাহা ছাড়া তাদের সময়ও নাই। বিভূতি থাকে কলিকাতায়; শম্ভু বাড়ী

থাকিলেও সকালে কাছারী যায়, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসে, ইহার ভিতর কখন ইহারা দেখা-শোনা করিবে? শিবরতন না দেখিলে কাজেই সম্পত্তিটা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আদায়-তহশীল ঠিক মত হইবে না, বেহিসাবী খরচ হইয়া অর্থ নষ্ট হইবে। শিবরতন মজ্জায় মজ্জায় হিসাবী লোক, অপব্যয় বা অপচয় তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁর দেখা শোনার অভাবে এমনি করিয়া বিভূতির কষ্টার্জ্জিত অর্থের কেনা সম্পত্তির অপচয় হইবে, ইহা ভাবিতেও তাঁর কষ্ট হইল।

তিনি যদি আজ রাগ বা অভিমান করিয়া এ সম্পত্তি দেখা-শোনা না করেন, মনে হইল তাহা হইলে তাঁর কর্ত্তব্য-হানি হইবে।

আবার এদিকে এই সম্পত্তির ব্যাপার লইয়া শম্ভু যে একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে, তাহারই বা কি প্রতিকার? শিবরতন শম্ভুকে বলিয়াছিলেন, শ্বশুর-বাড়ী গিয়া মেজবউকে সাধিয়া আনিতে। জ্যেষ্ঠের চিরঅনুগত শম্ভু এ বিষয়ে শিবরতনের আদেশ মানিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছিল। এখন কি করা যায়?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, জয়াব শরীরটা একটু সুস্থ হইলে শিবরতন একদিন তাকে বলিলেন, ব'লেছিলাম বউ মা, বিভূতি এ কাজটা ভাল-করেনি। ভাঙ্গা কাচ জোড়া দেওয়া যায় না, চেষ্টা ক'রতে গেলে সে আরও চার দিক দিয়ে ফেটে ফুটে চুরমার হয়। মন যেখানে ভেঙে গেছে, সেখানে বাইরে মেলামেশার চেষ্টা মিথ্যে। এখন এ নূতন আপদ নিয়ে যে আমি কি ক'রবো, ভেবে উঠতে পারছি নে। তুমি

এক কাজ কর। বিভূতিকে শনিবার দিন আসতে লিখে দাও, তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় একটা করা যাবে।

জয়া বিনীতভাবে ভাসুরের আদেশ পালন করিল। এই সম্পত্তি কেনার পর যে-সব কাণ্ড ইহা লইয়া হইয়া গেল, তাহাতে জয়ার প্রাণও চমকাইয়া গিয়াছিল। এই পরিবারে তাহার স্বামীর কাজের ফলে যে অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া পরিবারের ভিতর নূতন বন্ধনের সূত্র স্থাপনের চেষ্টায় সে ইচ্ছা করিয়াছিল যে নিতাই চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তিটা তাহার নামে না হইয়া সকলের নামে হয়। বিভূতি তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিল। জয়া স্বপ্নেও ভাবে নাই যে ইহা হইতে এমনি হিতে বিপরীত হইবে। সে ভাবিতেছিল, এ যে নূতন আগুন সে জ্বালিয়া দিল, ইহা কেমন করিয়া সে নিভাইবে!

সমস্ত কথা খোলসা করিয়া লিখিয়া সে বিভূতিকে মিনতি করিয়া শনিবার দিন আসিতে লিখিল।

শিবরতনও সংক্ষেপে সেই মর্ম্মেই বিভূতিকে পত্র লিখিলেন।

তার পর শিবরতন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজে শম্ভুর জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মেজ বউকে আনিতে গেলেন।

শম্ভুর শ্বশুরবাড়ীতে প্রবেশ করিতে তাঁহার পা উঠিতে চাহিল না। ইহার পূর্ব্বে একাধিক বার তিনি এবাড়ীতে আসিয়াছেন, সসম্মানে। শম্ভুর শ্যালক তারিণী, তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধাভরে সংবর্দ্ধনা করিয়াছে, সমস্ত পরিবার মিলিয়া তাঁহাকে তাহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সমাদর জানাইয়াছে, কিন্তু আজ এবাড়ীতে উঠিতে তাঁহার মাথা কাটা গেল।

রাগের ঝোঁকে শম্ভু যে অপকর্ম্ম করিয়া বসিয়াছে তার সম্পূর্ণ গ্লানি অভিভূত করিল শিবরতনকে। সেই অপরাধের লজ্জায়, তারিণী ও তার পরিবারের কাছে মুখ দেখাইতে তাঁর কুণ্ঠার সীমা ছিল না। তারপর কি বলিয়া, কেমন করিয়া যে তিনি মেজ বউকে বুঝাইয়া ঘরে ফিরাইয়া লইবেন, তাহা ভাবিয়া তিনি কূল পাইলেন না। অনেকবার অনেক রকম মুশাবিদা করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

এত দিন তিনি সমগ্র পরিবারের অবিসংবাদিত কর্ত্তা স্বরূপে সকলের মাথার উপর ছিলেন। তিনি করিয়াছেন আদেশ, আর সকলে সে আদেশ পালন করিয়াছে। আজ তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহাকে করিতে হইবে অনুনয়,—প্রার্থী হইয়া মেজ বউয়ের কাছে আজ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে। এই সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত কার্য্য করিতে তিনি দারুণ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন।

চোরের মত পা ফেলিয়া তিনি বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারিণীর বড় ছেলে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সাদরসংবর্দ্ধনা করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

তারিণী তখন বাড়ীতে ছিল না। তাহার পরিজনের একে একে আসিয়া শিবরতনকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, শিবরতন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে শিবরতন আশা করিতে লাগিলেন, এইবার মেজবউ আসিবে কিন্তু সে আসিল না। মেজবউ আসিল অনেক পরে—সবার শেষে।

এইবার শিবরতনের কণ্ঠ রোধ হইবার উপক্রম হইল। যে-কথা

তাঁহার বলা উচিত সেই কথা তিনি মুখে কিছুতেই আনিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ তিনিও নীরব রহিলেন, মেজবউও নীরবে মাথার কাপড় টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

তার পর শিবরতন ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোর মাকে বল যে আমরা তাঁকে নিতে এসেছি।

রাম মার কাছে আসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল, চল মা, বাড়ী চল।

মেজবউ কোনও উত্তর করিল না, প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে শিবরতন বলিলেন. বউমা, অপরাধ মানুষ মাত্রেই করে, কিন্তু মানুষের কাছেই সে ক্ষমা পায় তাই লোকে বেঁচে থাকে। শম্ভু, আমি, আমরা সবাই তোমার কাছে আজ অপরাধী, ক্ষমা ক'রে সবাইকে বাচিয়ে রাখলেই তুমি বাঁচবে মা, নইলে মঙ্গল যে কারও হবে না।

মেজবউ ছেলের হাত ধরিয়া কিছু বলি-বলি করিল কিন্তু বলিল না।

এমন সময় তারিণী আসিয়া সাড়ম্বরে শিবরতনের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, দিদিকে নিতে এসেছেন আপনি শুনলাম। আজই কি নিয়ে যেতে চান? তা' বেশ তো, এত তাড়া কি? এখন স্নানাহার করুন, তারপর দেখা যাবে'খন। যাবেই তো দিদি, নিজের বাড়ীঘর ছেড়ে আর ক'দিনই বা থাকবে? তা' এখন আপনি উঠুন, স্নানাহ্নিক —ও সে বুঝি সেরে এসেছেন। তবে, আমি একটা ডুব দিয়ে আসি, তারপর আহারাদি ক'রে—

হাসিয়া শিবরতন বলিলেন, না তারিণী, তার আগে তোমার দিদির জবাবটা শুনতে চাই। উনি যদি আমার সঙ্গে না যেতে চান, ওঁর কাছে যদি আমরা অপরাধীই থেকে যাই, তবে তোমার এখানে খাবার আমার কোনও অধিকার থাকবে না। উনি যদি যান তবেই আমি এখানে খাব।

তারিণী মেজবউয়ের মুখের দিকে চাহিল। রাম বলিল, বল' মা, যাবে বল'।

অনেকক্ষণ মুখ গুঁজিয়া থাকিয়া মেজবউ রামকে বলিল, তোর জ্যাঠামশায়কে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম ক'রতে বল্, ও-বেলায় আমি যাব ওঁর সঙ্গে।

শিবরতনের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তারিণী তাড়াতাড়ি স্নান করিতে ছুটিল. কিন্তু দিদির উত্তর শুনিয়া সে খুব খুসী হইয়াছে মনে হইল না।

মেজবউ এখানে আসিয়া তাহার অপমান ও লাঞ্ছনার কথা বিশেষ প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বলিয়াছিল যে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে। ঝগড়ার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছিল যে, বিভূতি তাহাকে সম্পত্তি কিনিয়া দিয়াছে, স্বামী ও ভাসুর সে সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এ কথাটায় তারিণী উৎসাহিত হইয়া বলিয়াছিল, কোনও ভয় নেই দিদি, আমি থাকতে তোমার সম্পত্তি কেড়ে নেয় কে, আমি দেখে নেব। তারপর হইতে সে মনে মনে মতলব ভাঁজিতেছিল যে, কি উপায়ে মেজবউয়ের এই সম্পত্তি টুকুর শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া ক্রমে সে তাহা গ্রাস করিতে পারে। মেজ-

বউকে এখানে রাখিতে পারিলে তার কাজ সহজ হইবে বিবেচনা করিয়া সে প্রতিদিনই ভগ্নীকে স্বামি-গৃহে না ফিরিবার পরামর্শ দিতেছিল, সম্পত্তির শাসন-সংরক্ষণ-ঘটিত নানা উপদেশ দিতেছিল। আজ হঠাৎ ভাসুরের এক কথায় ভগ্নীর এইরূপ চিত্তবিকৃতি হওয়ায় কাজেই সে অপ্রসন্ন হইয়া ভাবিল,—না, মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস নেই মোটেই।

মেজবউয়ের পক্ষে এত সহজে বাড়ী ফিরিতে সম্মত হওয়ারও সহজ কারণ এই যে, বাড়ী ছাড়িয়া, ছেলেদের ছাড়িয়া এ কয়দিনেই তার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তারপর তারিণীর কথাবার্ত্তা ও উৎসাহের আতিশয্যে তাহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, তারিণীর এ উৎসাহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়। সর্ব্বোপরি, আজ তারিণীর অনুপস্থিতিতে ভ্রাতৃ-বধূর সঙ্গে মেজবউয়ের সামান্য বিষয় লইয়া বেশ জোর ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, এবং সেই ঝগড়ার মুখে তারিণীর স্ত্রী তার মুখের উপর বলিয়াছে, শ্বশুর-বাড়ী থেকে ঝাঁটা খেয়ে বিদায় হ'য়ে এখানে ম'রতে এসেছ কেন?

এই সমুদয় কারণের সমবায়ে শিবব্রতনের দৌত্য এত সহজে সফল হইয়া গেল।

আহারাদি করিয়া শিবব্রতন তারিণীকে বলিলেন, তুমি ভায়া আমাদের সঙ্গেই চল। বউদের একটা স্ত্রীধন সম্পত্তি হ'য়েছে, তার শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়ে বড় গোলযোগে প'ড়েছি। তিন বউয়ের মত মিলছে না। তাই বিভূতিকে আসতে লিখে দিয়েছি। সে পরশু দিন আসবে—সে এলে সবাই মিলে পরামর্শ ক'রে একটা

ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি গেলে মেজবউমার সৎপরামর্শ পাবার সুবিধা হবে।

তারিণী মৃদুভাবে ওজর আপত্তি করিলেও অতি আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মত হইল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া শিবব্রতন বিভূতির পত্র পাইলেন। সে পত্রে সে সংক্ষেপে লিখিয়াছে যে শনিবার দিন তার আসা অসম্ভব। যে কোম্পানীতে সে চাকরী করে তাহাদের বোম্বাইয়ের আফিসে তাহাকে বদলী করা হইয়াছে। শনিবার দিন চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া রবিবার দিনই তাহাকে বোম্বাই রওনা হইতে হইবে।

পত্র পড়িয়া শিবব্রতন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। ব্যাপারটা খুব সরল বলিয়া তার মনে হইল না। হঠাৎ বোম্বাই বদলী হওয়ায় একবার বাড়ী আসিয়া দেখাটাও করিয়া যাইতে পারিবে না সে—এটা সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। মনে হইল, তলায় কিছু গলদ আছে।

অন্দরে অনুসন্ধান করিয়া শিবব্রতন জানিলেন যে, জয়ার কাছে বিভূতি কোনও পত্রই লেখে নাই, এই বদলী সংক্রান্ত কোনও কথাই সে জানে না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শিবব্রতন আবার ভাবিতে লাগিলেন।

৩০

বিভূতিরতন কলিকাতায় আসিয়াছিল জয়ার উপর এবং সমস্ত মৈত্রবংশের উপর একটা দারুণ ক্ষোভ ও অভিমান লইয়া। সে স্থির করিয়াছিল, থাক্ জয়া তার মৈত্র-পরিবার লইয়া, বিভূতি আর তার জন্য মাথা ঘামাইবে না।

যে কোম্পানীর আফিসে বিভূতি চাকরী করিত তাহাদের বোম্বাইয়ের আফিসে কাজ করিত অসিত কুমার ঘোষ। বেশ মোটা মাইনার সে চাকরী, কিন্তু অসিতের মোটেই সেখানে মন টিকিত না। দুই বছর হইল সে সেখানে গিয়াছে—ইতি মধ্যেই তার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। অনেক সাধ্যসাধনায় সে তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।

বড় সাহেবের কাছে অসিত বদলীর জন্য তদ্বির করিতে গিয়াছিল; সাহেব তাহাকে বলিলেন যে কলিকাতা আফিসের কোনও কর্ম্মচারী যদি তার সঙ্গে চাকরী বদল করিতে সম্মত হয় তবে তিনি অসিতকে বদলী করিতে পারেন। অসিত তখন তাহার গ্রেডের কর্ম্মচারীদিগের কাছে হাঁটা-হাঁটি করিতে লাগিল।

বিভূতির কাছে অসিত যখন আসিল, তখন বিভূতি ভাবিল ইহাই তার সুবর্ণ সুযোগ। মৈত্র-পরিবারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া অশেষ লাঞ্ছনা, তাদের অসংখ্য দাবী-দাওয়ার নিরন্তর টানাটানি, ছোট ছোট স্বার্থসংঘাতের নানা কোলাহল হইতে মুক্তি পাইবার ইহাই চমৎকার অবসর। সবচেয়ে বেশী করিয়া মনে হইল তার যে জয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইবার ইহাই একমাত্র সুযোগ। সে স্থির করিয়াছিল যে

জয়ার সঙ্গে তার মনের যোগের কোনও সূত্রই নাই। জয়া মৈত্র-পরিবারের ন'বউ, সে শুধু বিভূতি। পত্নীর কাছে তার কামনা একাগ্র একনিষ্ঠ প্রেম ও সেবার, কিন্তু জয়ার প্রাণ ভরিয়া আছে শুধু মৈত্র-পরিবারের সেবার আকাঙ্ক্ষায়। কাজেই তার সঙ্গে বিভূতির মনের মিলের অবসর নাই।

মনের মিল থাক বা না থাক, কলিকাতায় থাকিলে মিলিয়া থাকিতেই হইবে তাহাদের। আজ জয়া দেশে আছে—চিরদিন সে থাকিবে না। তার শরীর ভাল হইলেই সে চলিয়া আসিবে। তখন একটা নিতান্ত অশোভন চটাচটি না করিয়া তাকে তফাতে রাখিবার কোনও উপায়ই তাহার থাকিবে না।

তাই বিভূতি অসিতের প্রস্তাবে যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে চট্ করিয়া সম্মত হইয়া গেল।

অসিত বরং বিভূতির সম্মতিতে অবাক্ হইয়া গেল। বিভূতির কাছে সে খুব আশা করিয়া প্রস্তাব করে নাই। কেন না বিভূতি ও তাহার পরিবারের সম্বন্ধে দুই বৎসর পূর্ব্বে সে সব কথাই জানিত। তখন বিভূতিই তাহার কাছে তাহাদের পরিবারের সাবেক চাল, ভাইয়ে ভাইয়ে তাদের মনের মিল, যৌথ পরিবারের আদর্শ ইত্যাদি লইয়া অনেক গর্ব্ব করিয়াছে। অসিত জানিত যে বিভূতির জ্যেষ্ঠের আদেশ ছিল যে অন্ততঃ পক্ষান্তে একবার বিভূতির সস্ত্রীক বাড়ী যাওয়াই চাই, এবং বিভূতি সে আদেশ আনন্দের সহিত পালন করিত। যে বিভূতির ঘরের টান এত বেশী ছিল সে যে হঠাৎ এই দুই বৎসরের মধ্যে এতটা বা'রমুখো হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে সে বিস্মিত হইল।

অসিত বলিল, বাঁচালে ভাই। কিন্তু তুমি যে যাবে, তোমার বউদা' দেবেন যেতে ?

বিভূতি বলিল, তাঁর দেওয়া না দেওয়ায় কি যায় আসে ? তুমি জান না বোধ হয়, আমরা ভিন্ন হ'য়ে গেছি।

—অ্যা। তোমরা ভিন্ন হ'য়েছ। আদর্শ যৌথ পরিবার।

—হাঁ ভাই, আদর্শের ভোগ খেয়ে খেয়ে বদহজম হচ্ছিল, তাই এখন একটু আসল জীবন ভোগ করবার ইচ্ছে ক'রেছি। ওঃ! এ যে কি বন্ধন, আদর্শের চাপে প্রাণের যে কি দমফাটা, সে যে ভোগ ক'রেছে সেই জানে। মুক্তি পেয়েছি ভাই। দিনরাত মুখোস প'রে যেটা নয় সেইটাকে হাঁ ব'লতে ব'লতে মুখে ব্যথা ধরিয়ে ষ্টিলের চ'ড়ে বিকৃত চালে চ'লা—হয়রান হ'য়ে প'ড়েছিলাম ভাই। এখন মুক্তি পেয়েছি। সেই মুক্তিটাকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে যেতে চাই একেবারে দেশ ছাড়া হ'য়ে যেখানে মৈত্রবংশের ভূতের ছায়াও আমারে স্পর্শ ক'রতে পারবে না।

—বেঁচে থাক ভাই। তোমার যে এই মতি হ'য়েছে তাতে আমি বেঁচে গেলাম। পেট ভ'রে তোমার এই স্বাধীনতা ভোগ কর বোম্বাই গিয়ে। কিন্তু বছরখানেক স্বাধীনতা ভোগের পরে যদি আবার হাপ ধরে ভাই, তবে আমায় দোষ দিও না।

—হাঁপ ধ'রবে না আমার কখনও।

—আশীর্ব্বাদ করি যেন না ধরে। আমার কিন্তু ভাই ধ'রেছে। এ দুই বছর একলা থেকে বুঝেছি আত্মীয় পরিজনের কদর। যতক্ষণ ভালয় ভালয় সব চলে ততক্ষণ একলা থাকতে বেশ লাগে। কিন্তু,

কোনও বিপদ আপদ কিংবা বেযাড়া কোনও একটা কিছু এসে প'ড়লে তখন মনে হয—থাকতো যদি আমার ভাই কি বোন, কি বউদি কি পিসিমা। আমার ছেলেটার যখন টাইফয়েড হ'যেছিল, গিন্নী যখন আঁতুড়ে, তখন আমি একটু একটু ভেবেছিলাম এ কথা। কিন্তু সব চেয়ে বেশী মনে হ'যেছিল আমার একথা যখন আমাদের একটি বাঙ্গালী বন্ধু সেখানে হঠাৎ বেকার হ'যে সপরিবারে একেবারে না খেয়ে মারা যাবার মত হ'যেছিলেন। প্রথম প্রথম আমরা সবাই উৎসাহ ক'রে তাকে সাহায্য ক'রেছিলাম। কিন্তু যখন মাসের পর মাস যেতে যেতে শেষে বছর ঘুরে গেল, ভদ্রলোকের কাজের কোনও যোগাড় হ'ল না, দুরবস্থার একশেষ হ'ল তখন। মাস-কাবারে যখন তিনি এসে তাঁর সাহায্যের জন্য হাত পাততেন, তখন মনে হ'ত এ একটা দারুণ আপদ। থাকতো যদি তার একটা যৌথ পরিবার, তবে এ দুরবস্থা তার হ'ত না।

হাসিয়া বিভূতি বলিল, যৌথ পরিবার যাদের নেই তাদেরও এ দুরবস্থা হবার কোনও হেতু হয না যদি তারা সময থাকতে বুঝে সুঝে Insure করে। আজকাল অনেক রকমের বীমা হ'যেছে, সব আপদ বিপদেরই বীমা ক'রে রাখা যায়।

—হাঁ ভাই তা' ঠিক। অসুখ হয হাসপাতাল আছে, প্রসূতির জন্য Maternity Home আছে, Life Insurance আছে, Minimum income Insurance আছে। যে দেশে যৌথ পরিবার নেই সে দেশে এ সব উপায় উদ্ভাবন ক'রে পরিবারের পরস্পর আনুকূল্যের অভাবটা পূরণ করা হ'যেছে। কিন্তু আমাদের দেশে সে সুযোগ

এখনও কতটুকু হ'য়েছে?—বড় সহরের বাইরে, কোথায় এ সবের কতটুকু সুযোগ আছে?

—না থাকে সেইটাই করা দরকার। তা' না ক'রে, আপদ বিপদের insurance-এর দোহাই দিয়ে এই যৌথ পরিবার যদি আমরা জিইয়ে রাখি, তবে তাতে ক'রে আমাদের সমগ্র জাতিটাকে পঙ্গু ক'রে ফেলবো। তোমার বোধ হয় কোনও ধারণাই নেই যে একটা বৃহৎ পরিবারের অঙ্গ হ'য়ে সবার মুখ চাইতে চাইতে নিজের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বটাকে কতটা খাটো ক'রে ফেলতে হয়, নিজের দায়িত্বে নিজের প্রচেষ্টায় কোনও কিছু করবার শক্তি কতটা খাটো হ'য়ে যায়। আমি সেটা হাড়ে হাড়ে জানি, তাই বলছি যে এই যৌথ পরিবারের চেয়ে বড় অভিশাপ দেশের হ'তে পারে না।

—বল ভাই, বল। তুমি নূতন convert, তুমি তো ব'লবেই। কথায় বলে হিঁদু যদি মুসলমান হয় তবে সে হয় গোরু খাবার যম। যা'ক এ নিয়ে ঝগড়া ক'রবো না—তুমি যে রাজী তাতেই আমি সুখী।

যে দিন সব বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল, বিভূতি চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া বোম্বাই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, সেই দিনই শিবরতন ও জয়ার চিঠি পাইয়া বিভূতি শিবরতনকে খবরটা জানাইয়া দিল।

অসিতের সঙ্গে কথাবার্ত্তার ফলে বিভূতির মনে হইল যে তাহার এতদিন একটা মস্ত বড় ত্রুটি হইয়া গিয়াছে---সে তাহার জীবন-বীমা করে নাই। সে যাহা রোজগার করিত সকলই বাড়ী পাঠাইত, সে টাকার ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতেন শিবরতন। এখন তার মনে হইল

বীমা করা তাহার কর্ত্তব্য। সেই দিনই সে দুই তিনটা কোম্পানীতে জীবন-বীমার আবেদন করিয়া ফেলিল।

সংবাদটা সে কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না। গোপনে সে যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার শ্বশুর বাড়ীতেও সে কথাটা প্রকাশ করিল না। শিবরতনকে সে চিঠি লিখিল এমন সময় যাহাতে শিবরতন কোনও রকম বাধা দিবার সময় না পান।

একদিন শ্বশুর বাড়ীতে তাহার শ্বাশুড়ী বলিলেন, বাবা, এই শনিবার গিয়ে জয়াকে নিয়ে এসো। এখন তো সে বেশ সেরে উঠেছে, এখন আর সেই জঙ্গলের ভিতর তাকে ফেলে রেখো না।

বিভূতি একটু হাসিল, কোনও উত্তর করিল না।

শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী যখন বিরাজপুরের নানা বীভৎসতা আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—তার পচাপুকুর, বাঁশবন, সাপ-খোপ, অন্ধকার, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির কথা বলিলেন, তখন অবশেষে বিভূতি বলিল, কিন্তু মা, আপনার মেয়ের যে সেই বন-জঙ্গলই ক'লকাতার চেয়ে বেশী ভালো লাগে দেখতে পাই।

—তা' মিথ্যে বল নি বাবা, মেয়েটা যে কি অদ্ভুত! চিরদিন ক'লকাতার মানুষ তবু ওর সেই জঙ্গল যে কি ভালোই লাগে!

বিভূতি আবার বলিল, শুধু আপনার মেয়ের কেন মা, আপনার ছেলে শিশিরেরও দেখছি সেইখানটা বড্ড ভাল লেগেছে।

এ কথায় শিশিরের মা একটু মুখ ভার করিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, তা' কথাটা যখন ব'ল্লে বাবা, তখন বলি, শিশিরের রকম সকম আমার মোটে ভাল লাগছে না। এবার গিয়ে যা' দেখে

এলাম, সে তো মোটেই ভালো কথা নয়। ওই যে বুড়ী মেয়েটা, আমি ভেবেছিলাম মেয়েটা ভাল, কিন্তু—। কি করি বল তো? ওর গ্রাস থেকে শিশিরকে বাঁচাই কেমন ক'রে?

বিভূতি কোনও উত্তর করিল না।

শিশিরের মা আবার বলিয়া গেলেন, আমারই ভুল হ'য়েছে এতদিন ছেলেকে বিয়ে না দিয়ে। বিয়েই দিতে হচ্ছে ওকে, আর দেরী করা নয়।—আর ও যখন বিলেত যাচ্ছে, তখন যাবার আগে বিয়ে তো দিতেই হবে। তাড়াতাড়িই দিয়ে ফেলা যাক্। কি বল?

বিভূতি বলিল, শিশিরের বিলেত যাওয়া তবে ঠিক?

—হাঁ, ঠিক বই কি? ও ভয়ানক ঝুঁকেছে, আর সবাই যখন যাচ্ছে তখন যাক ও। কিন্তু যাবার আগে ওরে বিয়ে দিয়ে দেব। আর দেরী ক'রছি না।

একটু পরে তিনি বলিলেন, ভাবছিলাম, গিরির সঙ্গেই শিশিরের বিয়ে দিলে হয়, কি বল?

বিভূতির মুখে একটু ছায়া পড়িল। এই গিরির সঙ্গে শিশিরের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যে ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল তাহাতে অসম্মানের আঘাত বিভূতির গায়েও লাগিয়াছিল, তাই সে এ প্রস্তাবে খুব খুসী হইতে পারিল না। কিন্তু সে কথা না তুলিয়া সে বলিল, সে কথা আমি কি ব'লবো, দাদার কাছে লিখে দেখতে পারেন।

—তাঁদের আপত্তি হবে না, তাঁরাই তো তুলেছিলেন কথাটা। তখন আমি গা করি নি। যা' হ'ক তাই করি।

তিনি চিঠি লিখিলেন, জয়ার কাছে। লিখিলেন, জয়া যখন কথা

তুলিয়াছিল তখন তাঁর বিশেষ মত ছিল না। কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিলেন যে গিরির সঙ্গে শিশিরের বিবাহ হইলে মন্দ হয় না। অতএব তিনি এই খানেই শিশিরের বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা।

পত্রের উত্তর আসিল ফেরত ডাকে। জয়া এ পত্রের বিষয় শাশুড়ীকে জানাইবারও কোনও আবশ্যকতা অনুভব করিল না।

জয়া লিখিয়াছে, —

আপনি শিশিরের সঙ্গে গিরির বিবাহের কথা লিখিয়াছেন। তাহা হইতে পারিবে না। আপনার শ্বশুরবংশের কাছে আমার শ্বশুর বংশকে কোনও মতে খাটো করা, আমি বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না।

শিশিরেরও এ বিবাহে মত নাই। সে বুড়ীকে বিবাহ করিবে ইচ্ছা করিয়াছে এবং নিজে সেই খানেই বিবাহ স্থির করিয়াছে।

পত্র পড়িয়া জয়ার মা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিভূতিকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন, বিভূতি আফিসের কাজের তাড়ার অজুহাতে আসিল না।

তখন তিনি নিজেই বিভূতির বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, বিভূতির জিনিষ পত্র সব বাঁধা হইয়া গিয়াছে, সেই দিন রাত্রে বিভূতির বোম্বাই যাইবার কথা।

বিভূতি তখন বাড়ীতে ছিল না।

জয়ার মা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। একদিকে শিশিরের এই অবিমৃষ্যকারিতা, অপর দিকে বিভূতির এই সহসা

প্রবাস-যাত্রা—দুইটাই তাঁর চিত্তকে বিষম আলোড়িত করিতে লাগিল। কি করিবেন কিছুই তিনি ভাবিয়া পাইলেন না।

বিভূতির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া রহিলেন।

বিভূতি আসিলে তিনি বলিলেন, এ সব কি কাণ্ড। কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ বোম্বাই চ'লেছ—ব্যাপার খানা কি?

বিভূতি বলিল, আফিসের হুকুম, হঠাৎই যেতে হ'ল।

—ফিরবে কবে?

—ফিরবো না শীগিগ্‌র—সেখানে বদলী ক'রেছে।

—বদলী ক'রেছে তো মাথা কিনেছে। ছেড়ে দাও না চাকরী—ক'লকাতায় কি চাকরীর আকাল প'ড়েছে? দশটি নয় পাঁচটি নয়, দুটি মাত্র মেয়ে আমার, তার একটি থাকবে সেই বোম্বাইয়ে প'ড়ে, সে আমি সইতে পারবো না বাপু।

—না, সে সইতে হবে না আপনার। সে বিরাজপুরেই থাকবে। না হয় এখানে আপনার কাছে এনে রাখবেন।

—তার মানে?

—মানে কিছুই নেই। চাকরী ক'রতে আমি যাচ্ছি বোম্বাই—আপনার মেয়ের তো চাকরীর দায় নেই—সে এখানেই থাকবে।

জয়ার মা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি বলিলেন, একথা জয়া জানে?

—হাঁ, সেখানে চিঠি লিখে দিয়েছি।

—না—এ কিছুতেই হ'তে পারবে না। তোমার যাওয়া হবে না। তুমি চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে চিঠি লিখে দাও। এও কি একটা কথা হ'ল।

একটু তীব্র স্বরে বিভূতি বলিল, এক কথায় চাকরীতে ইস্তাফা দেওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে, আমার পক্ষে তা' সম্ভব নয়। আমার যেতেই হ'বে।

—আমি কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবো না। আমাকে না খুন ক'রে তুমি যেতে পারবে না।

বিভূতি বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। তার শাশুড়ী অশ্রুসিক্ত মুখে অনর্গল কথা বলিতে লাগিলেন, কখনও অনুনয়, কখনও তিরস্কার, কখনও অনুযোগ, কখনও শুধু আর্ত্তনাদ!

বিভূতি যেমন বিরক্ত হইল, তেমনি সে বিব্রত অনুভব করিল। কি করিবে সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

এমনি করিতে করিতে বেলা গড়াইয়া পড়িল।

এমন সময় মাল-মোটরা লইয়া একখানা গাড়ী আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। বিভূতি উপর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া মহা বিব্রত হইয়া উঠিল।

গাড়ী হইতে নামিলেন শিবরতন, বড়বউ, জয়া ও গিরিবালা! শিশিরকে তাঁরা পথে তাদের বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া আসিয়াছেন।

বিভূতির পত্র পাইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া শিবরতন ছুটিয়া আসিয়াছেন। এত তাড়াতাড়ি যে তাঁহারা আসিয়া পড়িবেন সে কল্পনা বিভূতি কখনও করে নাই।

৩১

নিঃশব্দে নত মস্তকে অগ্রসর হইয়া বিভূতি দাদা ও বউদিদির পাদ বন্দনা করিল।

শিবব্রতন বলিলেন, তোমার চেহারাটা বড় ভাল দেখছি না যে?—অসুখ ক'রেছে কিছু?

বিভূতি বলিল, না, কই? কিছু নয়।

উপরে উঠিয়া শিবব্রতন চারিদিকে যাত্রার আয়োজন দেখিয়া বলিলেন, তা' হ'লে আজ রাত্রে যাওয়াই ঠিক।

মাথা নত করিয়া বিভূতি বলিল, আজ্ঞে হাঁ, আজ না গেলে নয়।

—কোন গাড়ীতে যাবে? ই, আই, আর, না বি, এন, আর।

—ই, আই, আর মেলেই যাচ্ছি।

—টিকিট করা হ'য়ে গেছে বোধ হয়।

—আজ্ঞে হাঁ।

—তা' হ'লে তুমি এখনি গিয়ে ন'বউমার জন্যে একখানা টিকিট ক'রে এসো, আর অমনি আমাদের জন্যেও কাশীর টিকিট ক'রে এনো। —এক সঙ্গে অনেকটা রাস্তা যাওয়া যাবে।

বিভূতি একেবারে স্তব্ধ, হতভম্ব হইয়া গেল। জয়া এবং বড়দা আসিয়া তাহাকে বোম্বাই যাত্রা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিবেন এ আশঙ্কা তার মনে মনে ছিল, এবং সেজন্য সে কতকটা প্রস্তুতও হইয়া ছিল। কিন্তু বড়দা' যে হঠাৎ আসিয়া নির্ব্বিবাদে তার যাত্রায় সম্মতি দিয়া জয়াকে সঙ্গে পাঠাইবার উদ্যোগ করিবেন, ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই।

ইহাতে সে মনে মনে খুসী না হইয়া পারিল না। তবু সে একবার বলিল, এখন হঠাৎ ওঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা—

—সে জন্য কোনও চিন্তা নেই। বউমা যাবার জন্য সেখান থেকে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছেন। আর টাকাকড়িও তাঁর সঙ্গে আছে, তোমার দরকার হয় তো নিয়ে নিও।

—কিন্তু, আমি ব'লছিলাম—ওঁকে আর কিছু দিন পরে—

—সে হ'তেই পারে না। তুমি অত দূরদেশে একলা যাবে আর বউমা এখানে থাকবেন, সে কি হয়? এখানে থেকেই শরীরের যে চেহারা হ'য়েছে, সেখানে তোমায় দেখা-শোনা করবার লোক না থাকলে চ'লবে না। তা' ছাড়া ওঁকেই বা কে দেখবে শুনবে? স্তু বা মেজবউমার কাছে ওঁকে রাখা চলে না। আমরা তো যাচ্ছি কাশী—আমাদের ঘরের বউ বাপের বাড়ী গিয়ে প'ড়ে থাকতে তো পারবে না।

বিভূতি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভিতরের ঘরে গেল।

এই সব কথাবার্তা শুনিয়া জয়ার মা অবাক্ হইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিলেন। শিবরতনকে দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে তিনি বিভূতিকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁর কথাবার্তা শুনিয়া তিনি হতাশ হইলেন।

তখন তিনি বলিলেন, এসব কি হ'চ্ছে ছেলেমানষি? ওরা বোম্বাই যাবে সে কি কথা? বিভূতির এমন কি চাকরীর তাগাদা যে ওর সেই দূর দেশে গিয়ে প'ড়ে থাকতে হবে? ছেড়ে দিক না চাকরী—বিষয় আশয় ওর যা আছে, ওদের দুটি প্রাণীর তাতে বেশ চ'লে যাবে। ওকে

রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী—

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জমাখরচ	(রসগভ গল্পের বই)	১৷৷০

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

বহুরূপী	(হাস্যরসের বই)	১৷৷০
ঘূর্ণি	(উপন্যাস)	১৷৷০
স্বপ্নশেষ	(ঐ)	১৷৷০
সেতু	(শ্রেষ্ঠ গল্পগুচ্ছ)	১৷৷০

শ্রীকালিদাস রায়

পর্ণপুট (৫ম সংস্করণ)	(১ম ও ২য়)	১৷০ + ১৷০
হৈমন্তী	(অধুনাতন কাব্যসঞ্চয়ন)	১৷৷০
রসকদম্ব (২য় সংস্করণ)	(কমিক গান)	১৲
সাহিত্য প্রসঙ্গ	(১ম ও ২য়)	১৷৷০
ব্রজবেণু (২য় সংস্করণ)		১৲
আহ্বণী		২৲

শ্রীজগদীশ চন্দ্র গুপ্ত

স্মৃতিনী	(উপন্যাস)	১৷৷০
রতি ও বিরতি	(ঐ)	১৷০

বৎসরান্তে মেজবউ দেখিতে পাইল যে তারিণী আসাতে তাহার লাভ বিশেষ কিছু হইল না। তারিণী বলে, সম্পত্তির আদায়পত্র মোটে হইতেছে না, সদর রাজস্ব ও সেস দিয়া এক পয়সাও বাঁচে না। খাসখামারের জমিগুলির ফসলও নাকি সব পোকায় খাইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া শুনিয়া মেজবউ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে প্রথমে তারিণীকে গালিগালাজ করিল, তারিণী অম্লান বদনে গালাগালি হজম করিয়া সম্পত্তির উপস্বত্ব অপহরণ করিয়া চলিল। শম্ভুর কাছে মেজবউ এ সম্পত্তির কথা তুলিলেই সে কাণে হাত দিয়া দৌড় মারে। মেজবউ মহা বিপদে পড়িল।

শিবরতনের তীর্থভ্রমণ তখনও শেষ হয় নাই। তিনি তখন হরিদ্বারে।

মেজবউ হরিদ্বারে ভাসুরের কাছে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া চিঠি লিখিল। পরিশেষে সে লিখিল—

আমি আপনার চরণে বার বার বহু অপরাধ করিয়াছি, চিরদিনই সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। বুদ্ধি-হীনা কন্যার এই শেষ অপরাধ ক্ষমা করিয়া দয়া করিয়া দেশে ফিরিবেন। আপনি না ফিরিলে সমস্ত সম্পত্তি তছ্‌নছ্‌ হইয়া যাইবে, ছেলে পিলে-দের শেষে প'রে বসিতে হইবে। দয়া করিয়া ফিরিয়া আসিবেন— আমার অপরাধের যে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন মাথা পাতিয়া লইব— শুধু দয়া করিয়া আপনি আবার আসিয়া সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করুন।

মেজবউয়ের পত্রে যে-সব কথা লেখা ছিল তাহা পড়িয়া শিবরতন বুঝিলেন যে এমনিভাবে যদি চলে তবে সব সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়া

অসম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর তীর্থ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি বিভূতির পত্রে জানিলেন বিভূতি আবার কলিকাতায় বদলী হইয়াছে।

শারদীয়া পূজা তখন আসন্ন। শিবব্রতন বিপুল আয়োজন করিয়া দেবীর পূজা করিলেন। অনেক দিন পর তিন ভাই ও বধূরা মনের গ্লানি মিটাইয়া আবার এক সঙ্গে মিলিত হইয়া দেবীর অর্চ্চনা করিলেন।

নবমী পূজা অন্তে সমগ্র পরিবার মিলিয়া শান্তিজল গ্রহণ করিবার সময় শিবব্রতন সাশ্রুনয়নে দেবীর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ঘরের লক্ষ্মীর অপমান ক'রে আমি বড় অপরাধ করেছি মা। সন্তানের সে অপরাধ ক্ষমা করেছ মা? দয়া ক'রেছ আমায়?

সমাপ্ত

থামাও বাবা, থামাও। তোমরা বুঝতে পারছো না, ও আমাদের উপর রাগ ক'রে যাচ্ছে।

শিবব্রতন বলিলেন, না মাউইমা, ভাল চাকরী মিছেমিছি ছাড়বে কেন? বোম্বাই এমন কি দূর দেশ? কত লোক যে কত দূর দেশে গিয়ে বড় হ'চ্ছে। রাগের কথা ব'লছেন? রাগ যদি ক'রেই থাকে বিভূতি, তবে দূর দেশে গেলেই সে রাগটা প'ড়বে শিগ্‌গির। আপনার লোকের সঙ্গে মনোভঙ্গ হ'লে কাছে থাকাটাই দোষের কারণ হয়, তাতে নিত্য নূতন খিটিমিটি। দূরে গেলে আপনার লোকের জন্য টানটা বেশী হয়। এখন বিভূতি যে দূরে যাচ্ছে এটা আমি ভালো মনে ক'রছি। আমাদের ভিতর যদি কোনও বিরোধ গড়ে উঠে থাকে তবে এতেই তার নিবৃত্তি হবে।

বিভূতি তার শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল জয়া নিঃশব্দে ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে। সে ঘরে আসিতেই জয়া ধরা করিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তোমার কাছে অপরাধ ক'রেছি ক্ষমা কর—আমায় ছেড়ে যেও না।

যে অশ্রুর বন্যা সে কোনও মতে চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া তার সমস্ত মুখ ভাসাইয়া দিল।

বিভূতি তাহাকে টানিয়া উঠাইয়া বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে শান্ত করিল। তারপর উৎফুল্ল অন্তরে সে ষ্টেশনে গেল টিকিট করিতে।